গল্পের গরু ন্যাদোশ

মহাশ্বেতা দেবী

অঙ্কুর প্রকাশনী
৩৭/এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৭০০০০৯

পরমাস্নেহে

তথাগতকে

ঠাকুমা

গল্পের গরু গাছে ওঠে, আর আমার মায়ের গরু দোতলায় উঠত, মাছ মাংস খেত। মাকে যিনি মানুষ করেন, তাঁর সেই মণিমাসি, আমাদের মণি দিদিমা, এখন তিরানব্বই বছরেও বেঁচে আছেন।

দেওঘরে থাকেন তিনি কয়েক শ' গরু নিয়ে। তাঁর গরুরা শীতকালে চা খায়, বারো মাস আতপ চালের ফেন ভাত খায়। ঠাণ্ডায় গায়ে কম্বলের জামা পরে। মা বোধহয় গরু-প্রীতি তার কাছে পেয়েছেন। এখনো আমার মার গরু থাকে। সে গরু আমরা চোখে দেখি নি। কেননা সে পটলবাবুর বাগানে চরে, মেনকার বাড়িতে বাচ্চা দেয়, পুন্নির মা তার দুধ দুয়ে খায়।

আমার বাবা মার জন্যে, সেই গরুর জন্যে খড় খোল ভুষি কিনে চলেন। গরু দেখাশোনা করতে যতীন আসে। গরুকে অবশ্য বাড়িতে কেউ দেখি নি।

১৯৪৪ এর শেষাশেষি বা ১৯৪৫ এর গোড়ায় বাবা মফঃস্বলের সেই শহরটায় বদলি হলেন। শান্ত শহরটিতে বাবার বদলী হওয়া উচিত ছিল কিনা আজও মনে হয়। আমি থাকিতাম শান্তিনিকেতনে। আমার এক ভাই এক বোন ফলওয়ালাদের জমা নেওয়া সব আম আর লিচুগাছ সাবাড় করে দিত। ফলওয়ালারা বাবার কাছে পয়সা নিয়ে নিত। বাবা প্রায়ই ভোর বেলা মাছ ধরতে স্টেশনে চলে যেতেন। স্টেশন থেকে সবচেয়ে বড় মাছটা কিনে তার মুড়ো থেকে ল্যাজা অব্দি নতুন বঁড়শি বিশ পঁচিশটা বিঁধিয়ে নিয়ে চলে আসতেন। এসেই বলতেন, পুকুরে যেই ছিপ ফেললাম···।

যাক, বাবার দুজন চাপরাশী ছিল। তারা দুই ভাই। এখন তারা যে শহরের গণ্যমান্য লোক আর তাদের যারা অফিসার ছিলেন, তাঁদের চেয়ে অনেক বড় বাড়ি হাঁকিয়েছে তারা, নামটা আর নাই

বললাম। ছোটভাই আমাদের দুধের যোগান দিত। সে দুধ মায়ের পছন্দ নয়। বাবার পরামর্শের লোক ছিল মা বা আমরা নয়, আপিসের মালী, রিকসাঅলা, আমের ব্যাপারী। তারাই সব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ঠিক করে দিত। কে কোন স্কুলে পড়বে, এ বছর কত মণ চাল কিনে রাখা হবে, পুজোতে কোথায় যাওয়া হবে। বাবা যখন বাড়ি করলেন, তাও হয়েছিল রাজমিস্ত্রী আর গরু দেখার লোক যতীনের পরামর্শে। সেইজন্য সে বাড়িতে থাকার ঘর ছটা। ঢোকার আর বেরুবার ফটক আটটা। জানালা দরজা অগুনতি, জলের ট্যাঙ্কটা দশতলা বাড়ির ট্যাঙ্কের মাপের।

মারও পরামর্শের লোক ছিল বাড়ির কাজের লোকেরা—সত্যনারায়ণ ঠাকুর, মেনকা আর নারাণ। তারা বলে দিত পুজোতে কার কি রকম জামা-কাপড় কেনা হবে, কোন উৎসবে কি রান্না বান্না হবে।

মার দল আলাদা, বাবার দল আলাদা। দুদলে অনেক এ ওর উপর অবিশ্বাসের ব্যাপার ছিল। বুদ্ধির লড়াইও চলত। যাক, মা তার দলের পরামর্শে ছোট চাপরাশীর কাছ থেকে গরু কিনলেন। শোনা গেল বাড়িতে দুধের সমস্যা এবার ঘুচল।

এই প্রথম, মার কোন গুরুত্বপূর্ণ কেনা-কাটার ব্যাপারে নারাণের পরামর্শ নেওয়া হল না।

নারাণ আবার আমাদের কাউকে বিশ্বাস করত না। ও সব সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ করত আমার যে ভাইটি চলে গেছে, সেই অবুর সঙ্গে। অবুর বয়স তখন দশ বছর। নারাণ বিয়ে করতে যাবে পাত্রী দেখতে যেত অবু। নারাণ একবার অবুকে নিয়ে বেলডাঙার হাটে গিয়ে মার জন্য গরু কিনে ছিল, গরু কিনলে হাঁটিয়ে আনতে হয়।

হাঁটিয়ে আনবার সময়েই গণ্ডগোল হয়েছিল কেননা নারাণ মাঝে মধ্যে গাঁজা খেতে বসে যেত। যাহোক, নারাণ কিনলো কালো বকনা গরু। মা যখন নতুন গাইয়ের খুরে জল আর কপালে সিন্দুর দেবেন

বলে দাঁড়িয়ে আছেন, দেখা গেল এক পেল্লায় সাদা বলদ নিয়ে নারাণ আসছে। সেই জন্যেই নারাণকে পরামর্শ করা হয় নি। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝেছ গরু কেনার টাকা বাবা দেবেন, কিন্তু তার সঙ্গে এ বিষয়ে কোন পরামর্শ করা হবে না।

তাই ছোট চাপরাশীর বকনা গাই মা কিনলেন। আর এই গরু কেনার সময় থেকে বাবা আর নারাণের যেন কিরকম একটা আপস হয়ে গেল। দুজনেই মুচকে হাসলেন। তারপর কখন সন্দেহ করে বললেন, নারাণ! গাই কেনা হচ্ছে বলে হাসলে কেন? গাই ভাল নয়?

নারাণ বলল 'তা কেন?

বাবাকে মা কিছু জিগোস করেন নি।

ইনকাম-ট্যাক্স্ আপিসে কাজ করতে করতে বাবাই জানালা দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন ন্যাদোশকে ছোট থেকে বড় হতে। বাবা সবই জানতেন। কিন্তু কিছু বলেন নি।

গাই বাড়িতে এল। এরকম কুচ্ছিত গাই তোমরা জীবনে দেখনি। পেট মোটা। চারটে ঠ্যাং বাইরের দিকে ছত্রানো, ছেটানো, ল্যাগবেগে। ল্যাজটা শক্ত। চোখের চাউনিটা কেমন হিংস্র টাইপের।

গাইকে বরণ টরণ করে মা ছোট চাপরাশীকে নতুন কাপড় দিলেন। ও সে কাপড়টা নিয়ে বাড়ির পাশের ধোপঘাটিতে স্নান করতে নামল। ধুতিটা কেচে পাড়ে মেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ন্যাদোশ কচরমচর করে ধুতির অর্দ্ধেকটা ছিঁড়ল. তারপর ছোট চাপরাশী যতবার উঠতে যায়, ততবার ওকে জলে ফেলে দিল।

মা বললেন আহা? মনের কষ্টে ওরকম করছে। ছেলে পিলেকে বাবা যদি পরের হাতে দিয়ে দেয়, তাদের কষ্ট হয় না?

বাবা ভীষণ চিন্তিত হলেন। আপিসের মালীকে বললেন, তোর গিন্নি মা যা করল. এর ফল বহুদূর গড়াবে।

কিন্তু সে গড়ানো যে কি গড়ানো তা বাবাও বোঝেন নি।

হ্যাদোশের সম্পূর্ণ জীবনী লেখা সম্ভব নয়। হ্যাদোশ লিখে গেলে তা লেখা হতে পারত, কিন্তু হ্যাদোশ যদিও স্কুলের সব ক্লাসের পড়ার বই'ই খেয়েছিল (যেহেতু আমরা নজন ভাই-বোন আর আমি একা তখন কলেজে পড়ি, সেহেতু সব ক্লাসের পড়ার বইই বাড়িতে থাকত), কলম বা কালি খায় নি। কলম বা কালির প্রতি বিদ্বেষ বা সে বিষয়ে ভয় থাকলে লেখা যায় না। হ্যাদোশের লেখাটা হল না কলম খেলনা বলে। যাক, অতি সত্বর দেখা গেল, হ্যাদোশ যে কোন সময়ে ঘরে উঠে এসে (বাড়িটা একতলা ছিল) পড়ার বই খেয়ে ফেলছে। বাবা বলতেন, 'অমনি করেই তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শেখা যায়। চেয়ে দেখ, কি ডিটারমিনেশানে বই খাচ্ছে।'

সত্যি, তাড়াতাড়ি সব জেনে ফেলার জন্যে হ্যাদোশ ব্যাকরণ থেকে ইংরাজীতে পত্র রচনার বই অবধি সব খেয়ে ফেলত। বুঝতেই পারছ, হ্যাদোশের সে পর্যায়ে ওর গোবর থেকে ঘুঁটে দেওয়া যেত না কিছুতে। অনীশ অবু আর ফন্তুর বই ও ভালবাসত কিন্তু সবচেয়ে ছোট ভাই টান্টুর বইই সবচেয়ে পছন্দ ছিল ওর। সেজ বোন মিতুল আর চতুর্থ বোন বুড়ি ছোটবেলায় বদ্ধ পাগল ছিল। ওদের বই খেত বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে। ছোট বোন শারীর আর সেজ বোন কঙ্কির বই আর ফ্রক দুইই খেত। বাবার গেঞ্জি আর কয়েকটা টাই ছাড়া কিছু খায় নি। রঙের বিষয়ে ওর মতামত ছিল খুব (কোন্ বিষয়ে বা ছিল না), আর নীল রঙের যা দেখত তাই খেত। বাবার গেঞ্জিতে সেই থেকে আজও নীল দেওয়া হয় না।

এই খেয়ে ওর বোধহয় জ্ঞান হয়েছিল মাছ-মাংস না খেলে শরীর ভাল হয় না, ওকে অমিষাশী করার জন্যে আমি আর মা দায়ী। সেবার বাসন মাজার লোক আসছিল না। আমরা কলাপাতায় খেয়ে এঁটো পাতা বাইরে ফেলে দিতাম।

ইলিশ মাছের কাঁটামাখা পাতা খেয়ে হ্যাদোশের মাছ মাংসে রুচি হল। মা সব সময়ে ওকে বোঝান, গরু মাছ খায় না।

ন্যাদোশ তা মানবে কেন? একদিন ও খোল আর ভুষির মাটির গামলা লাথি মেরে ভাঙল। ভীষণ রাগে ফোঁস ফোঁস করল। তারপর সোজা রান্না ঘরে ঢুকে ওবেলার জন্যে অল্প ভেজে রাখা সবগুলো ইলিশমাছ খেয়ে ফেলল, বেড়ালের ভয়ে নয়, ন্যাদোশের ভয়ে মা শিকেতে মাছ মাংস রাখা শুরু করেন। যতদিন তা করা হয় নি ও বড় মাছ, ছোট মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, মাংস সবই খেয়েছে। তবে ইলিশ মাছ আর মুরগিটাই পছন্দ করত।

মাছ-মাংস খেলেই পেঁয়াজ রসুন খাবে জানা কথা। তরকারির ঝুড়ি ঘেঁটে তাও খেত।

বাবা আর নারাণ বলাবলি হত, গরুর গতিক খুব মন্দ দিকে যাচ্ছে দিন দিন। নন্দন রিকশাআলাও বাবাকে বলেছিলেন, 'সম্ভবত ন্যাদোশকে ভূতে পেয়েছে।'

মাছ মাংস খেলে বাঘের মত পায়ের ওপর খেল হবে। শেষে ওকে গোয়ালে বন্ধ করে রাখা হত। মার গরুদের সবসময়ে খোলা বাতাস দরকার হয়। তাই গয়ালে সবসময় বাঁট মত দরজা থাকত, ওপরটা তার কাটা। ন্যাদোশ সেই ফাঁক দিয়ে জিম করবেটের রুদ্রপ্রয়াগের চিতার মত লাফ মারত! একবারও পা হড়কে যেত না। বেরিয়ে এসেই খট খট করে রান্নাঘরে উঠে আসত। কোনদিন নিরামিষ হ ল রেগে যেত কি। চোখ লাল করে তাকাত।

এরপরেই একদিন ও সম্পূর্ণ নতুন পথ ধরল। ভোর হলেই বেরিয়ে যেতে থাকল। মা বলতেন, 'ভোরের বাতাস খাচ্ছে' কিন্তু ও যে এমন পুলিশ বিরোধী—তা কে জানত!

ভোরে গঙ্গার ধারে গিয়ে ও দাঁড়িয়ে থাকত। বিহারী কনষ্টেবলরা গঙ্গা থেকে স্নান সেরে যতবার পাড়ে উঠত, ততবার ওদেও ঢুঁ মেরে জলে ফেলে দিত। ব্রিটিশ পুলিশের সঙ্গে লড়া সোজা কথা নয়। ন্যাদোশ বোধহয় পরাধীন ভারতের একমাত্র গরু, যার নামে অনেক পুলিশ কেশ হয়েছিল। এ পর্যায়টাও বেশ কিছুদিন থাকে।

সেবার ন্যাদোশ বছর খানেক বাড়ি ছেড়ে কোর্ট অঞ্চলে রইল। বাছুরও দিয়ে ছিল আদালতের মাঠে আর ওর দুধ কে খেয়েছিল জানি না। কেননা পাকা পাকা গোয়ালরাও ন্যাদোশের দুধ দোয়াতে পারে নি।

এইভাবে, ভয়ঙ্কর স্পীডে জীবনের তিনভাগ কাটিয়ে, একদিন খটখট করে ও বাড়ি ফিরল। মার সে কি আনন্দ! 'ন্যাদোশ' ফিরেছে, ন্যাদোশ ভাল হয়ে গেছে, ন্যাদোশের মনে পড়েছে ও বাড়ির গরু।'

তখন ওর খড় টাল করে রাখা হত ছাতে। একদিন বেজায় খটখট শব্দ। দেখা গেল ন্যাদোশ গম্ভীর ভাবে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। গোয়ালের খড় নয়, ছাতের খড়ই ওর পছন্দ। অনীশ আর অব, ছেলেরা যেমন যুক্তিবাদী হয়, মাকে বোঝালে, ন্যাদোশ না কি বিজ্ঞানীদের মত সবকিছুর উৎসে যেতে চায়। গোয়ালের খড়-টড় নয়, সে খড় যেখান থেকে আসছে, সেই খড়ই ওর পছন্দ।

তখন শীতকাল। পূর্ণিমার দিন। ন্যাদোশ সকালে বেরিয়ে গিয়েছিল, বিকেলে ফিরল। খুব একটা নেশা নেশাভাব। মেনকা খবর দিল, গাছীরা যে তালের রস জমা করেছিল, ন্যাদোশ গাছীদের তাড়িয়ে দিয়ে সারাদিন রোদে বসে এন্তার তালের রস খেয়েছে। ওর বেজায় নেশাও হয়েছে। পা টলিয়ে টলিয়ে ও হাঁটছে।

কিন্তু ন্যাদোশ সে অবস্থাতেই ছাতে উঠে গেল। খড় খেতে খেতে এক সময়ে, যখন চাঁদ উঠছে, ও ন্যাড়া ছাতের আলসেতে দাঁড়িয়ে গেল।

সেই যে দাঁড়াল, আর ন্যাদোশ নড়ে না। আমরা বেজায় ভয় পেলাম, পাশের বাড়ির মেসোমশাইকে সবাই ভয় পায়। উনি চাঁদ দেখতে মাসে এক বার জানলা খোলেন, জানা কথা। ন্যাদোশ ওর নজর থেকে চাঁদকে আড়াল করে রেখেছে; আর হলও তাই। মেসোমশাই জানলা খুলেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ-কি! এ কি! আমি

পূর্ণিমার চাঁদ দেখব, গরুর শিঙ্গুয়েট দেখছি কেন? গরু অল্প অল্প টলছে কেন? একি!'

সেদিন বাবাই ন্যাদোশকে নামিয়েছিলেন।

এই রকম জীবন যাপনের ফলেই বোধহয় ন্যাদোশের অসুখ হল। বিশ্ব সংসারকে ভয় পেতনা। কিন্তু মিতুল ওকে একটা 'সীট' দেখাত। বাবা, বাবার গ্রুপের পরামর্শে অনেক দরকারী জিনিস কিনে খেলাতেন।

যখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে। যুদ্ধের জীপ গাড়িতে খাকি কাপড়ের গদী বা সীট থাকত। সেগুলো বাবা কার পরামর্শে কলকাতা থেকে অনেক কিনে নিয়ে যান। মিতুল সেই রকম একটা সীট দেখালে ন্যাদোশ একমাত্র ভয় পেত আর চারটে ঠ্যাং ছেতরে মাটিতে পড়ে যেত।

ন্যাদোশের অসুখ হতে পশুচিকিৎসক বা ভেট্ এলেন। 'কি হয়েছে বাবা?' বলে কাছে এগোতেই ন্যাদোশ তাঁকে তাড়া করল। তিনি হাঁউমাউ করে বারান্দার থাম দু হাত দু পায়ে আঁকড়ে ধরলেন। ন্যাদোশ ওঁর প্যান্টের পেছনে ঢুঁ মারতে থাকল। সে কি কেলেঙ্কারি শেষে ওঁকেই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হল।

ওই অসুখেই ন্যাদোশ মরে যায়। কিছুই করা যায় নি ওর জন্য। ওর কাছেই যেতে পারে নি কেউ। এখনো আমার ন্যাদোশের কথা খুব মনে হয়। ন্যাদোশকে ভোলা অসম্ভব।

ভাইয়াসাহেব

আজ তোমাদের যে গল্পটা বলছি, সেটা কিন্তু একেবারে আজকের ঘটনা। আমি যখন গল্পটা লিখছি, তখনো এ ঘটনা ঘটেছে। তোমরা গল্পটা পড়ে শেষ করতে না করতে হয়তো আরো কত ঘটনা ঘটে গেছে। তাই বলতে পারো, এ হ'ল সেই গল্প, যা কখনো ফুরায় না, ফুরোয় নি।

গল্পটা সুরু করার আগে তোমাদের কয়েকটা কথা বলা দরকার। কথাগুলো জানলে গল্পটি বুঝতে তোমাদের সুবিধে হবে।

তোমরা জানলে খুব অবাক হয়ে যাবে। আমাদের দেশে প্রায় প্রায় সব রাজ্যেই এখনো একরকম প্রথা আছে। যার নাম বনডেড লেবার। ওটা ইংরেজি কথা তো। তাই আমরা একে বলব ভূমিদাস প্রথা।

কেমন সে প্রথা।

কোন লোক হয়তো বিপদে পড়ে গ্রামের বড়লোকের কাছে ধার নিল। টাকাটা আট আনা থেকে এক হাজার যে কোনো অঙ্কের হতে পারে।

লোকটা তো লেখাপড়া জানে না। যে ধার দিল সে একটা সাদা কাগজ দিয়ে বলল, তোর এখন বিপদের সময়। তুই একটা টিপছাপ দিয়ে দে বাবা। কত টাকা নিলি, কবে শোধ দিবি, তা আমি পরে লিখে রাখব।

তারপর কি দেখা গেল বল ত?

টাকা যা নিয়েছে, তার সুদ এত বেশি যে কোনমতেই তা শোধ হতে পারে না।

লোকটার গরু গেল, ছাগল গেল, এক টুকরো জমি ছিল তাও চলে গেল। ধার আর শোধ হয় না।

তখন লোকটা আরেকটা সাদা কাগজে টিপছাপ দিয়ে সেই বড় লোকটির ভূমিদাস হয়ে গেল।

সে রোজ কিছু খেতে পাবে আর মাসে মাসে কিছু টাকা পাবে এই শর্ত হল। চব্বিশ ঘণ্টা খেটে চলবে সে বড়লোকটির জন্য। আর খেটে খেটে ধার শোধ করবে।

কিন্তু সে টাকা কোনদিন কোন ভূমিদাস হাতে পায় নি টাকা দেবার সময় হলেই বড়লোকটি বলে, টাকা নিবি কি রে? সে টাকা তো তোর ধার শোধ করতে কেটে নিচ্ছি।

গরিব লোকটি নিজে না হয় বড়লোকটির বাড়িতে খাটছে। আর যা হোক কিছু খেতে পাচ্ছে।

কিন্তু তার তো বউ, ছেলে, মেয়ে, মা, বাবা, সবাই আছে? বাড়িতে কারো অসুখ হল, হয়তো কারো বিয়ে হবে, হয়তো কেউ মারা গেছে—তাকে সৎকার করতে হবে, শ্রাদ্ধ করতে হবে—যে কোন কারণেই হোক না কেন, তার তো টাকা দরকার হয়।

বাড়ির লোকজন খাবে, স জন্যও টাকা দরকার হয়। আর স টাকা এই বড়লোকটিই দেয়।

তারপর গরিব লোকটি যদি বলে, মালিক! আমিতো একশো টাকা ধার নিয়েছিলাম মোটে। আপনি আমার জমি নিলেন, গরু নিলেন, ছাগল নিলেন, সব নিলেন তাতেও ধার শোধ হল না। তারপর আমি দশ বছর ধরে খেটে যাচ্ছি। সে টাকাও কেটে নিচ্ছেন। এখন দেখবেন তো, টাকাটা শোধ হল নাকি?

বড়লোকটি বলবে, আরে! এখনো তো কয়েক হাজার টাকা বাকি আছে রে।

কয়েক হাজার টাকা?

হ্যাঁ রে।

তা কি করে হবে হুজুর?

তুই তো অঙ্ক জানিস না। একশো টাকার ওপর সুদ নেই?

একমাসেই তো একশো টাকায় একশো টাকা সুদ হল।

অঙ্ক তো বুঝি না হুজুর।

কি বুঝিস?

ছুটি চাই।

তা কি করে হবে? আমার টাকা শোধ হল না, এখনই তোকে ছুটি দেব?

আমি যদি মরে যাই?

তোর ছেলে খাটিবে তোর জায়গায়।

সে মরে গেলে?

তার ছেলে খাটিবে। আর যতদিন না ধার শোধ হচ্ছে, ততদিন তোদের খাটিতেই হবে। নইলে মরে গেলে নরকে চলে যাবি নরকে চলে যাবি, বুঝলি?

গরিব লোকটি জন্মের পর জন্ম, বাপের পর ছেলে তারপর নাতি, এভাবে দাস খেটে চলে।

এরাই হল ভূমিদাস বা বনডেড লেবার। ১৯৭৫ সালে আইন করে এ প্রথা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভূমিদাস প্রথা এখনো চলছে। নানান কৃত্রিম নামে।

গুজরাটে এদের নাম হালি।

দক্ষিণ মাদ্রাজে এদের নাম ইজুভা, চেরুমা, পুলেইয়া, হোলিয়া।

মাদ্রাজের পূর্বতীরে এরা পাড়িয়াল।

তামিলনাড়ুতে আছে পান্নিয়াল, পাখিয়াল।

অন্ধ্রে আছে গসিৎগুলা।

হায়দ্রাবাদে এরা ভাগেলা।

অযোধ্যায় সানোয়াক।

মধ্যভারতে হরোয়াহা।

কর্ণাটকে এরা জীথা।

মধ্যপ্রদেশে বড়াশালিয়া।

বিহারে আছে কামিয়া, সেওকিয়া, জানোর।

ওড়িষ্যাতে গোথি, বারমামিয়া, নাগামুলিয়া, দান্দামুলিয়া।

জম্বু ও কাশ্মীরে জানা, মানঝি, লাঝারি।

কেরলে এদের নাম বেগার।

রাজস্থানে এরা সাগরি।

মহারাষ্ট্রে এরা বেঠ অথবা বেগার।

পশ্চিমবঙ্গে ভাতুয়া, মাহিন্দার, বারোমাসিয়া, বাগাল।

আমি যতক্ষণ ধরে গল্পটা লিখছি, তোমরা যতক্ষণ ধরে লেখা পড়ছ, তারমধ্যেই কোথাও কোনো গ্রামে ভারতের কোন রাজ্যে কেউ না কেউ ভূমিদাস হয়ে যাচ্ছে।

তেমনি এক ভূমিদাস অঞ্চল নিয়েই আমার গল্প।

পালামৌ জেলার এক পাহাড়-জঙ্গল এলাকার এক গ্রাম। গ্রামের নাম কোরা। পাহাড় ও জঙ্গলের কোলের গ্রামের মাটি খুব উর্বর হয় না সবসময়ে। তবে কোরা গ্রামের মাটি খুব ভালো।

কারণ হচ্ছে সেও গ্রামের জমিমালিক হাবিলদার সিং। সে জাতে রাজপুত। কোরার মত পঞ্চাশটা গ্রাম জুড়ে তার জমি আর ফলের বাগান আর গরু মোষের বাসস্থান।

পঞ্চাশটা গ্রামে হাবিলদারের হাজার খানেক কামিয়া। গ্রামের পর গ্রাম দেখবে ঝোপড়ি। যাকে বলে নিচু নিচু কুঁড়েঘর।

সেও গ্রামে পৌঁছলে কি দেখবে?

হঠাৎ মনে হবে বুঝি সেকালে চলে গেছ।

দেখবে এই উঁচু দোতলা বাড়ি।

বাড়ির সামনে দুটো হাতি।

আস্তাবলে সার সার ঘোড়া।

কাছারি ঘরের দেয়ালে সার সার বন্দুক।

বাড়ির একদিকে পাঁচিল ঘেরা ফলের বাগান। আম পেয়ারা—পেঁপে—আতা—জাম—লিচু গাছ। সবশুদ্ধ আড়াই হাজার

গাছ। এসব গাছের ফল হাবিলদার নিজে খায় আর বাজারে বেচে।

হাবিলদারের আছে একদল গুণ্ডা। তারাই গ্রামগুলোকে শায়েস্তা রাখে।

গভর্নমেণ্টের কোন আইনকানুন হাবিলদারের রাজ্যে চলে না। ওর রাজ্যে কোন থানা নেই।

ডাকঘর একটা আছে সেও গ্রামে।

সরকারী নিয়ম অনুসারে এই এলাকায় কয়েকটা স্কুল খোলা হয়েছিল।

হাবিলদার সিং তো রেগে গরম।

ইস্কুল? ইস্কুল কি হবে?

ছেলেরা পড়বে।

না না, গ্রামে গ্রামে তো থাকে শুধু দুসাদ, গঞ্জু, ধোবি, চামার, নাগেসিয়া, ঘাসি, ওরাওঁ, এইসব ছোটলোক। ওরা পড়বে না।

ওদের জন্যই স্কুল দরকার।

না না, আমি চাই না ওরা লেখাপড়া শিখুক। লেখাপড়া জানলেই বলবে আমরাও হিসাব জানি। তখন আর কামিয়া থাকতে চাইবে না।

তবু সরকারী নিয়মে পাঁচটা স্কুল হয়েছিল। স্কুল হল, মাস্টার এলেন।

হাবিলদারের লোকেরা গ্রামে গ্রামে বলে এল, যদি কোনো ছেলে স্কুলে যায় তার ডান হাতটা কেটে নেব তার বাড়িঘর পুড়িয়ে দেব।

কোনো ছেলে গেল না পড়তে। কে যাবে?

সরকারী স্কুলগুলি উঠে গেল। ছাত্র যদি না আসে, তাহলে সরকার খরচ করে স্কুল চালাবে কেন?

স্কুল একটা রয়ে গেল সেই গ্রামে। রাজপুতদের ছেলেরা পড়বে

বলে। তারা ওই চা'র ক্লাসই পড়ে। অঙ্কটা শেখে, টাকার হিসেব রাখবে বলে।

হাবিলদারের জীবনে একটা বড় দুঃখের জায়গা আছে। তার ছেলে মরে গেছে। নাতিটি তার খুব প্রিয়। নাতিকে তার পুত্রবধূ দুর্গা কিছুতেই হাবিলদারের মনের মত করে মানুষ করতে দিচ্ছে না।

লেখাপড়া শেখাচ্ছে। বারো বছরের ছেলে, সে পড়ছে সাত ক্লাসে। সেও গ্রামে তো স্কুল নেই। ছেলেকে সে রেখেছে রাঁচি শহরে এক বোর্ডিং ইস্কুলে।

ছুটিছাটায় ছেলেকে গ্রামে আসতে দিতেও সে নারাজ। ছেলেটা অসৎ ছেলেদের বাড়ি চলে যায় ছুটি কাটাতে। যদি বাড়ি আসে, তাহলে কামিয়া ছেলেদের সঙ্গে জঙ্গলে পাহাড়ে ঘোরে। এসব খুবই অপছন্দ হাবিলদারের।

বন্দুক চালাতে শেখো প্রতাপ।

কেন, কেন?

বন্দুক চালালে তবে তো লোকজন শায়েস্তা থাকবে।

না, আমি বন্দুক চালাব না।

কেন?

আমার ভাল লাগে না।

কেন? তোমার বাবা কেমন বন্দুক চালাত।

বাবার মত, তোমার মত মানুষ মারার জন্যে আমি বন্দুক চালাব না।

বন্দুক চালালে বাঘ মারব।

শুনে হাবিলদার বেজায় রেগে ওঠে। প্রতাপকে মনে হয় ওর শত্রু। কিন্তু কিছু করতে পারে না।

প্রতাপের মা দুর্গাকে হাবিলদার মনে মনে ভয় পায়। তার কারণটা খুব পরিষ্কার। দুর্গা নওরতনগড়ের রাজার বোনের মেয়ে। এ অঞ্চলে নওরতনগড়ের রাজাদের এখনো খুব প্রতাপ।

দুর্গার কোনো ক্ষতি করলে তারা ক্ষেপে যাবে। এই হাবিলদার সিং বাইরের জগত সম্বন্ধে কোনো খোঁজ খবর রাখত না। হঠাৎ একদিন তার কানে এল এক অদ্ভুত গুজব। আর কোনো ছেলে নয়। কামিয়াদের ষোল থেকে পঁচিশ বছরের ছেলেরা না কি অলৌকিক ভাবে উধাও হয়ে যাচ্ছে। এই আছে, এই নেই, অদ্ভুত ঘটনা।

হাবিলদার বলল, বেটারা পালাচ্ছে।

হাবিলদারের কথা শুনে তার গোমস্তা মুনিমজী বলল, না না।

এ সেই নতুন ডাকাতের কাণ্ড।

কে নতুন ডাকাত ?

শুনলাম তার নাম ভাইয়াসাহেব।

ভাইয়াসাহেব ?

হাঁ হুজুর। আপনি শোনেন নি ?

কেমন করে শুনব, বোকা ?

সবাই তো শুনেছে।

আমি কি সেও ছেড়ে কোথাও যাই ?

সে এক ভয়ংকর ডাকু। পুলিসও তাকে কিছু করতে পারে না। সে রামপুর, থারু, মানহাট, তিন জায়গায় গিয়ে যা করেছে তা বলতে ভয় করছে।

কি করেছে সে ?

রামপুরের মালিক মনোহর সিংয়ের মাথা কেটে বাজারে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

আঁ। ? বল কি ?

থারু থানার সামনে, মানে কাছাকাছি মেলা হচ্ছিল। সেখানে মেরে দিয়েছে ত্রিপুরী সিংকে।

আরে ! কিছু জানি না ?

মানহাটের লোকরা সকালে ঘোড়ার ডাকে অবাক হয়ে দেখে রাজারাম সিংকে মেরে ঘোড়ার পিঠে বেঁধে ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছে কে যেন।

এ সব কথা কোথায় শুনলে ?

শহর থেকে শুনে এলাম।

"ভাইয়াসাহেব" নামটাও শুনলে ?

সবাই বলছে এ তারই কাজ ?

সবাই তাকে ডাকু বলছে ?

পুলিশ তো তাই বলছে।

ডাকু হলে সে লুঠতরাজ করত। দেখ, আমার মনে হচ্ছে এ ডাকু নয়। এ কোনো কারণে শোধ নেবার জন্যে এই তিনজনকে মেরে ফেলেছে।

লুঠতরাজও করছে তো ?

কি লুঠ করছে ?

হুজুর, গম-চাল-লবণ-গুড।

অ্যাঁ ?

হাবিলদার সিং হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে তার দমবন্ধ হবার যোগাড়।

তারপর সে বলল, আরে! কোনো গরিব লোক হবে। তাই সোনাদানা ফেলে গম-চাল লুটছে।

তা হবে হুজুর।

করছে কি ? খাচ্ছে ?

না না, সেই তো তাজ্জব বাত। সব নিয়ে গ্রামেই বিলিয়ে দিচ্ছে। আর কত কি বলছে ?

কি বলছে ?

বলছে, ভাই সব! এ তোমাদেরি গম, তোমাদেরি চাল। মালিক জোর করে তোমাদের জমি কেড়ে নিয়েছিল আগে। সেই জমির ফসল সরিয়ে রেখেছিল। এখন তোমরা সবাই নিয়ে যাও, পেট ভরে খাও।

অ্যাঁ ? এর মানে কি হল ? এই কে আছিস রে! গণেশকে ডেকে শীগগির।

হাবিলদার সিং তো মস্ত সম্মানী লোক। তাই সে নিজে কিছু করে না। একেক রকম কাজ করার জন্যে সে একেক রকম লোক রেখেছে। গণেশ প্রসাদ নামে একজন মিচকে রোগা লোক আছে, তার কাজ হল মাথাখাটানো। যে কাজে মাথা খাটাতে হয়, সে কাজে গণেশ চলে আসে।

হাবিলদারের বাকি সব লোকরা হল মারদাঙ্গা পার্টি।

যাও তো, কয়েকটা গ্রাম জ্বালিয়ে দাও।

যাও তো, হাতি দিয়ে ঘরটা ভেঙে দাও।

কামিয়াগুলোকে চাবুক মারো তো।

এই সব ভালো ভালো কাজ করার লোক অনেক আছে। কিন্তু চিন্তা করার লোক একটাও নেই।

তাই গণেশ প্রসাদকে রাখা।

এই গণেশের বাবা মা-দাদা-ভাই এরা এক সময়ে এ গ্রামে বেশ জমিজমাওয়ালা লোকই ছিল। হাবিলদার তাদের জমিজমা কেড়ে নেয় ফলে তারা গ্রাম ছেড়ে চলেও যায় একদিন। কিন্তু কোরা নদীর বানে না কি তারা ভেসেও যায়। শুধু গণেশ বেঁচেছিল।

ছোট্ট সাতবছরের গণেশকে ওই মুনিমজী নিয়ে আসে। বলে, ও থাকুক গে।

হাবিলদার বলল, থাকুক।

ও মা! গণেশ টকাটক চার ক্লাস পাস করে ফেলল এই স্কুলে। মুনিমজী বলল, ও শহরের স্কুলে আরো পড়ে আসুক হুজুর।

কেন?

আমাদের জমিজমার খাতাপত্র দেখবে, মামলা মোকদ্দমার তদারক করবে।

হাবিলদারের মনটা খুব ভাল ছিল। কোরা গ্রামের পাঁচঘর দুসাদ সরকারের জমি পেয়েছিল। জমিগুলো সবে কেড়ে নেয়া গেছে।

সে বলেছিল, তা মন্দ বল নি।

স্কুলে পড়াশোনা করে গণেশ ফিরে এল। খুব বুদ্ধি ওর। বন্দুক চালাতে পারে না, রাতদিন কাছারিতে বসে সব কাগজপত্র নকল করে।

আর চিন্তা করে সব বলে দেয়।

এই যে সেবার বেজায় ঝড় উঠল, তাতে হাবিলদারের সেও গ্রামে কোনো ঝড় হল না। এর কারণ কি?

গণেশ অনেক চিন্তা করে বলল, মালিক! ঝড়টা আসছিল। হঠাৎ ঝড়ের দেবতা দেখল একি? আমি কি পাগল হয়ে গেছি? নইলে হাবিলদারের রাজ্যে প্রলয় ঘটাতে চলেছি! সে যে মস্ত বড় বীর। বীর বুঝে বীরের মর্যাদা। সেই জন্যে ঝড় চলে গেল।

ব্যাখ্যা শুনে হাবিলদার বেজায় খুশি। তৎক্ষণাৎ গণেশকে দুটো টাকা দিল।

বলছি বটে দুটো টাকা--কিন্তু এ টাকার অনেক দাম। প্রথম কারণ হল, হাবিলদারের হাত থেকে পয়সা বের করা এক দুঃসাধ্য কাজ।

দ্বিতীয় কারণটি আরো অদ্ভুত। হাবিলদার সিংয়ের বাড়িতে আছে এক সিন্দুক, সেকেলে রামচাঁদী টাকা। খাঁটি রূপোর ভারি টাকা। হাবিলদারকে কেউ কিছু বোঝাতে পারে না, কিন্তু বছরে একবার ও যাবেই যাবে টাহাড়ের শিবমন্দিরে। সে মন্দিরের পুরোহিত হনুমান মিশ্র বলেছেন, রামচাঁদী টাকা, যার বাড়িতে আছে, সে যেন তা দান করে দেয়। টাকাগুলো অপয়া। ও টাকা ঘরে থাকলে ছেলে মরে যায়।

এ-কথা শুনে আসার পরেই হাবিলদারের ছেলে যদি বন্দুক নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে দুর্ঘটনায় মরে যায়, তাহলে হাবিলদার রামচাঁদী টাকা ঘরে রাখতে চাইবে কেন? রামচাঁদী টাকাও দান করে।

গণেশ মাঝেমাঝেই টাকা পায়। এইতো সেবার কি কাণ্ড। হঠাৎ হাবিলদারের বাগান থেকে পেয়ারা আর আতা উধাও হয়ে যেতে থাকল।

পাঁচিলঘেরা বাগান, তিনটে মালী পাহারা দেয়। ফল যায় কোথা?

গণেশকে ডাকা হল। গণেশ ভেবে চিন্তে বলল, এ তাহলে হনুমানের কাজ।

হনুমান? কি করা যায়?

হাবিলদার মস্তানরা বলল, মারব?

শুনে হাবিলদার রেগে কাঁই। হনুমান কি কামিয়ার দল? দুটো কেন, দশটা মারলেও এসে যাবে না? হনুমান হল গিয়ে রামের সেবক। হনুমানজীর মূর্তি গড়িয়ে মন্দিরে রেখে পূজো করছে কতজন।

গণেশ বলল, দেখি মন্ত্র পড়ে বাঁধা যায় কি না। মালীদের বেরিয়ে আসতে বলুন। আমি বাগানটা মন্ত্র পড়ে বেঁধে দিই।

মন্ত্র পড়ে দিল গণেশ। সেই থেকে হনুমানের আসা-যাওয়া নেই আর।

শুধু মুনিমজী আড়ালে ডেকে বলল, গণেশ? হনুমান ফল খায়, বাগান তছনছ করে না এই প্রথম দেখলাম।

গণেশ বলল, হ্যাঁ, আমারও খুব অবাক লাগল ব্যাপারটা।

যা করছিস, বুঝেসুঝে করিস।

নিশ্চয়।

এই গণেশকে ডাকল হাবিলদার সিং। বলল, এই ভাইয়াসাহেব ডাকাতের কাণ্ড শোনো।

সব সে বলে গেল। তারপর বলল, কেন এ রকম করছে লোকটা? আমি তো বুঝতেই পারছিনা।

গণেশ বলল, এ তো খুব সোজা কথা মালিক। আজকাল হরদম সিনেমায় দেখাচ্ছে ডাকুরা ডাকাতি করে আর গরিবকে গম চাল দেয়।

তাই না কি? তারপর?

ডাকুরা হরদম এইসব করতে থাকে। তারপর কোন সন্ন্যাসী চলে আসে, তাকে হিমালয়ে নিয়ে যায়।

তারপর কি হয়?

ডাকুরা হিমালয়ে গেলেই ভালো হয়ে যায়।

কেন? কেন?

হিমালয়ে তো খুব ঠাণ্ডা। মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যায় আর ভালো বুদ্ধি ফিরে আসে।

হাবিলদার তো কোথাও যায় না, তার এলাকায় খবরের কাগজ আসে না। সে জীবনেও সিনেমা দেখে নি। গণেশ মাঝে মাঝে সহরে যায় আর সিনেমা দেখে বলে শোনা যায়। তার মুখে এ সব কথা শুনে হাবিলদার খুব মজা পায়।

এর পরেই হাবিলদার জিগ্যেস করল, কাম্বিয়া ছেলেগুলো কোথায় যাচ্ছে?

মালিক! এ ডাকাত যখন, তখন নিশ্চয় নরবলি দেবার জন্যে ছেলে নিয়ে যাচ্ছে।

কেন, কেন?

ডাকাতি করতে গেলে দিতেই হবে।

নিয়ম আছে কোন?

তাই তো শুনেছি।

বটে! তা আমার এতগুলো গুণ্ডা মস্তান পোষা কি জন্যে? তারা ডাকাতটা ধরতে পারছে না?

হিমু বলল, অনেকের দরকার নেই মালিক। একটা ভালো ঘোড়া আর একটা বন্দুক নেব, সকালে বেরিয়ে যাব, বিকেলে ডাকাতটার মাথা নিয়ে চলে আসব।

সাবাস!

এ সব কথা হল দুপুরবেলা। তারপর গণেশ বলল, মালিক! যদি হুকুম করেন, আমি ওর সঙ্গে যাই।

তুমি ?

কখনো ডাকাত দেখিনি।

হিমু সদয় হয়ে বলল, না না গণেশ! রক্ত দেখলে তুই ভয় পাস কত। তোর যখন ডাকাত দেখার ইচ্ছা, তখন কিছু দড়িও নিয়ে যাই মালিক। ডাকাতটাকে বেঁধে নিয়ে চলে আসব এখন।

সেই ভালো হবে। সবাই দেখবে, তারপর ঘেটাকে মারব। এতবড় আস্পদ্দা? আমার এলাকার কামিয়া ছেলেদের ধরে নিয়ে যাওয়া?

যতক্ষণ ধরে কথাবার্তা চলল, ততক্ষণ একটি লোক বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

হাবিলদার বলল, ও কে?

ও জিতা তুসাদ হুজুর।

কি চায়?

টাকা চায়।

টাকা? কেন রে জিতা?

হুজুর, বউয়ের অসুখ।

কত টাকা নিবি?

দশ টাকা।

দেব টাকা। তবে তোকে নয়, ছেলেকে দেব। টাকার বদলে সে কামিয়া হয়ে থাকবে।

ছেলে!—জিতা কেঁদে ফেলল, ছেলেই যদি থাকবে হুজুর তাহলে আর কি বলছি।

তোর ছেলে কি মরে গেল?

না হুজুর। কি বলব আপনাকে। রাতে শুয়ে আছে, হঠাৎ যে কি শুনল। বিছানায় উঠে বসল আর দুই হাত মাথার ওপর তুলে কাকে নমস্কার করে বলল, আসছি মহারাজ! এখনি আসছি। বলেই দৌড়ে চলে গেল।

চলে গেল ?

কত ডাকলাম, পেছনে ছুটলাম, সে দৌড়ে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। আজ আমি তো কাজে এলাম, সবাই তো খুঁজেছে কত।

কোনো পাত্তা নেই।

বাজে গল্প করছিস ?

আমার তো একার যায়নি মালিক। চান তো খবর নিন। সব ঘরে একই ঘটনা ঘটেছে। পঞ্চাশটা গ্রামের মধ্যে সাত আটটা গ্রাম থেকে ছেলে নিখোঁজ।

না, ব্যাপারটা গুরুতর।—মুনিমজী বলে।

হাবিলদার বলে, এখন কোনো টাকা হবে না। বউ হোক, ছেলে হোক, একজন কামিয়া বনে তো টাকা দেব।

জিতা আর কথা বলে না। চলে যায়।

হিমু বলে, কাল সব ফর্সা হয়ে যাবে। কোনো ডাকু যদি বদমাশি করে।

আমাকে চেনে না তো ?

হিমু একথা বলতে পারে। মস্ত জোয়ান সে, বছর তিরিশ বয়েস। চাষীদের ঘরে আগুন জ্বালাতে মানুষকে খুঁচিয়ে মারতে ওর জুড়ি নেই।

জিতা হুসাদ ঘরের দিকে যেতে থাকে। হঠাৎ, যেন মাটি ফুঁড়ে ওর সামনে এসে দাঁড়ায় গণেশ।

জিতা, জিতা, তোমার বুদ্ধি হবে কবে ?

কেন গণেশ ? কেন ?

ছেলের কথাটা বললে কেন ?

ভুল করলাম ?

বললে কেন ?

মাথা নামিয়ে জিতা বলল, তার হুকুম।

ও।

আর কি বলবে ?

হিমু যাচ্ছে সেটাও বলে দিও।

জিতা সরল বিশ্বাসে বলল, সে জন তো দেবতাই হবে। তাকে তো দেখতে পাইনা। জঙ্গলে গিয়ে হেঁকে বলে আমি মনের কথা জানি। সে সব জেনে যায়। কেমন করে জানে ?

কেমন করে ?

বনের গাছ-পাথর শুনে নেয় আর তাকে বলে দেয়।

তাহলে তাই হবে।

তাই তো হয়।

তাহলে তাই বলে দিও।

দেব। গ্রামের বাচ্চারা জিগ্যেস করছে।

কি ?

গণেশ পেয়ারা-আতা আবার কবে খাওয়াবে ?

আবার কয়েকদিন বাদে।

মালিক জেনে গেলে তো সর্বনাশ।

সর্বনাশ বলে সর্বনাশ !

তুমি যাও গণেশ। তোমার জন্যেও আমরা খুব ভয়ে ভয়ে থাকি। মালিক যদি কোনোদিন জানতে পারে !

না, জানবে না।

তোমার বাবা-মা-দাদা সবাইকে মনে পড়ে।

আমার শুধু মনে পড়ে ওদের ভেসে যাওয়াটা।

তখন তো তুমি ছোট।

গণেশ হাসে। বলে, তবু মনে আছে। যাও জিতা, ঘরে যাও। বেলা যে আর নেই।

আর জিতা ঘরে না গিয়ে বনের পথ ধরল। বনে ঢোকার মুখে গাছগুলি ফাঁক ফাঁক, দূরে দূরে। কিন্তু ভিতরে চলে যাও, দেখবে বন কিন্তু ভিতরে চলে যাও, দেখবে বন কেমন ঘন। ভিতরে চলো, আরো

ভিতরে। দেখবে বন কত ঘন। যেন অন্ধকার বর্ষাকালের মেঘঢাকা চির সন্ধ্যার দেশ সেটা।

চলতে গেলে বোঝা যায় বনভূমি কেমন কখনো উঁচু, কোথাও খাদ নেমেছে। খাদের মুখ লতা জালে ঢাকা। এ হল সংরক্ষিত অরণ্য। বনে তেমন বড় জানোয়ার নেই আর। রাজপুত মালিকরা শিকার করে করে বহুকাল আগেই বড় জানোয়ার শেষ করেছে। ফলে যদি থেকে থাকে কিছু, সরে গেছে কুরুডা বনে।

এ বনের সবচেয়ে মোহনীয় আকর্ষণ হল কোরা নদীর উপশাখা হিরণ। অঞ্চলের ভাষায় হিরণ মানে হরিণ। যেন হরিণ শিশুর মতই নেচে নেচে বনভূমিকে সরস করে হিরণ নদীটির তিরতিরে কাচের মত জল, পাথর বাঁধাই পাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলে গেছে পাঁচ কিলোমিটার ধরে।

এক জায়গায় শোনা যায় গমগম, ঝমঝম শব্দ। হিরণ যেখানে হঠাৎ এক খাদের মধ্যে ঝরে পড়ে নশব্দে, পাথরে প্রতিধ্বনি তুলে। অনেক নিচে ঝরে পড়ে তার জল, তা গ্রানাইট পাথরের পাড়ে গমগমিয়ে বাজে।

তারপর পাতালের মত গভীরে আধ কিলোমিটার বয়ে হিরণ বেরিয়ে পড়ে আবার। নেচে নেচে, অস্থির চপলতায় গিয়ে কুরুডার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখানে দুই নদীর সঙ্গমে একটি ছোট বারাজ-বাঁধ হবার কথা বহুকাল ধরেই হয়ে আসছে।

এই বনের ভিতরেই চলে আসে জিতা, একটি বড় তেঁতুল গাছের কাছে দাঁড়ায়। ঘন ছায়া ঢাকা বিশাল গাছটি। বহুকাল ফল দেয় না। তার নীচে একটি বড় পাথর। এখানে বনের মাটি খানিক উঁচু বলে গাছটি যত উঁচু, তার চেয়েও উঁচু দেখায়।

জিতার তো দৃঢ় বিশ্বাস ভাইয়াসাহেব কোনো দেবতা হবে। সে হাত জোড় করে চোখ বুজে বসে ও দ্রুত বলে, যে হও তুমি দেওদেওতা, হিমু কাল তোমাকে মারতে আসছে! এই ব্যস্।

কে যেন তার পিঠ দিয়ে কি বুলায়। জিতা চমকে দেখে একটা সজারু অত্যন্ত মনোযোগে তাকে দেখছে। সজারুটার গায়ের নড়াচড়ায় একটা ছোট বুনো গাছের পাতা শুদ্ধ সরু ডাল তার পিঠে একে ছুঁয়েছে।

জিতা সজারুটাকেও নমস্কার করে। কে জানে ওটা সজারু না দেবতাদের ছলনা।

পরদিন হিমু আসার আগে রীতিমত একটা তোড়জোড়ের পালা শুরু হয়ে যায় সেও গ্রামে।

হিমু অনেকদিন হাতের খেলা দেখাতে পারে নি। অতএব সে একা যেতে চায়। তার সহচররা বলেছে, হাঁ হাঁ জী। জরুর যাবে। তুমি যা করতে পারবে একা, সে তো দশ মস্তানের কাজ। আমরা জানি তুমি কি পারো।

আরে মালিকের হুকুমে খুনজখম তো আজ থেকে করছি না। এখন খুন না করলেই খারাপ লাগে।

হাবিলদার বলেছে, যে ঘোড়াটা ইচ্ছে হয় নাও। যে বন্দুক ইচ্ছে, সেটাই নাও।

খুব সরগরম আলোচনা হয়েছে। হিমু যে ডাকুটাকে মেরে অথবা না মেরে এনে হাজির করবেই তাতে কারো সন্দেহই নেই। হিমু কি কম জোয়ান আর বীর?

হাবিলদার বলেছে, হিমু ডাকুটাকে আনলে পরে আমি হিমুকে এক শোটা রামচাঁদী টাকা দেব।

মুনিমজী বলেছে, পুলিশও মেডেল দেবে।

পুলিশের মেডেল? আরে ছো ছো ছো! সে মেডেলে তো সোনা থাকে না, দামও তিন পয়সা।

সে একটা সম্মান মালিক।

সম্মান? ছো ছো ছো! আমি ওকে রেখেছি, তাতে ওর সম্মান অনেক বেশি, বল না হিমু?

জী মালিক যা বলেন।

সে তোমার ইচ্ছে হলে নিও। তবে কাজটা হাসিল করতে হবে। ভেবে দেখলাম, যারা মরেছে তারাও জমিমালিক। আমার জাতভাই। তাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া আমার কর্তব্য।

যা বলেছেন মালিক।

আর এক কথা। মুনিমজী! খুব ভালো করে একটা খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত কর। দুটো মোটা সোটা ভেড়া কাটাও। মাংস হোক, আর জাফরানী পোলাও। আমার মনে একটা চমৎকার ইচ্ছে হচ্ছে।

কি ইচ্ছে মালিক?

ডাকাতটাকে খোঁটায় বেঁধে একটু একটু করে মারব আর তাই দেখতে দেখতে খানা খাব।

জী মালিক।

যাও অন্দরে যাও। চাল-ঘি, আর যা যা লাগবে চেয়ে আনো। রান্নার ব্যবস্থা কর।

সবাই হাবিলদারের বাড়ির ভিতরে যেতে পায় না। হুকুম নেই। মুনিমজী খুব বুড়ো হয়েছে, অনেককাল আছে এ বাড়িতে। সে যেতে পারে।

মুনিমজীর কাছে সব শুনে দুর্গা বলল, একটা লোককে খুঁচিয়ে মারবে আর তাই দেখে খানা খাবে?

তাই তো বলছে।

ওঃ, আর কত সহ্য করব?

কি করবে মা তুমি।

দুর্গা ছোট একটা পুরিয়া এনে দিল। বলল, লোকটাকে ছেড়ে দিতে তো পারবেন না। সে সাহস আপনার নেই। যে ভাবেই হোক এই বিষটুকু ওকে দেবেন।

বিষ।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বিষ। খেলেই লোকটা নিমেষে মরবে। আর ওকে কোনো কষ্ট সইতে হবে না।

তা দেব। তা পারব।

মুনিমজী চলে গেল। দুর্গার দাসী বলল, চল, খাবি চল্।

আর ভেবে কি করবি।

এ দুর্গার বাপের বাড়ির দাসী। দুর্গার একমাত্র আপনজন এ বাড়িতে। দুর্গা বলল. এ খবর শুনে কেউ খেতে পারে।

খাব না আমি।

এখান থেকে না চলে গেলে মরে যাবি তুই।

জানি।

দুর্গা বলল, এ কাজ যদি করে ও, তাহলে আমি আর কিছু ভাবব না। চলে যাব যেমন করে হোক। পুলিস এনে ধরাব ওকে। যদি আমি রাজপুতের মেয়ে হই. এ কাজ করব।

পুলিস কি ওর গায়ে হাত দেবে।

দেবে না। এত বড়লোক!

এত বড়লোক!

তাহলে অন্য কিছু করব।

কি আর করবি।

আর যা করি, স্বামীর অত্যাচার দেখে দেখে পাগল পাগল হয়ে আমার শাশুড়ি যেমন বিষ খেয়ে মরেছিল, তা করতে যাবনা। পাপী বেঁচে থাকল, তাতে মরে শান্তি পাব না।

কি করবি।

যা হয় করব কিছু একটা।

সারাদিন দুর্গা কাম চেপে বিছানায় শুয়ে থাকল। বাইরে ভোজের রান্না চলছে, সেই সঙ্গে চলছে হররা। ওদের হাসি আর হল্লা দুর্গার কানে যেন বিঁধে যাচ্ছে।

আর সহ্য হয় না দুর্গার। কামিয়া রাখে অন্যরাও। কিন্তু ওই

গুণ্ডাগুলো লোহার শিক তাতিয়ে কামিয়াদের পিঠে মাংস পুড়িয়ে ঢ্যারা চিহ্ন দেগে দেয়। বাচ্চা ছেলে মেয়েদেরও রেহাই দেয় না। তাদের আর্ত চীৎকার দুর্গার বুকে বিঁধে যায়।

সাধে কি সে তার ছেলেকে এখানে রাখতে চায় না? এখানে থাকলে ছেলেটাও হবে অমনি রাক্ষস।

গুণ্ডাগুলো বিনা কারণে হরিজনদের মারে, ঘর জ্বালায়। এ সবই হল দুর্গার শ্বশুর হাবিলদারের নিয়ম।

কেন? কেন? কেন?

কতবার জিগ্যেস করেছে দুর্গা। হাবিলদার সিংয়ের সামনে আসেনি সে। পর্দার আড়াল থেকে জিগেস করেছে। হাবিলদার বলেছে, এর দরকার আছে।

কেন?

দাগা দিলে কামিয়া পালিয়ে পার পাবে না।

সেইজন্যে?

হ্যাঁ। আর বছরে একবার হরিজন মারতে হয়, ঘর জ্বালাতে হয়, তাহলে ওরা জব্দ থাকে।

এই পাপে আপনি অপুত্রক হয়েছেন।

একেবারে চুপ করো।

দুর্গা ক্রমেই বুঝেছে এ নরপিশাচ, এ নরপিশাচ, এ রাক্ষস। নিজের বাপের উপরও দুর্জয় রাগ হয়েছে তার। বাড়িতে মাস্টার রেখে লেখাপড়া শিখিয়ে এ রকম একটা বাড়িতে তাকে বিয়ে দিল কেন?

বাপের বাড়ি থেকে তাকে মাঝে মাঝে নিতে আসে ভাইরা। দুর্গা যায় না।

বলে, বাবাকে গিয়ে বোল তিনি অনেক সোনা, অনেক টাকা দিয়ে অনেক সোনা, অনেক টাকাওয়ালা ঘরে বিয়ে দিয়েছেন যখন, তখন আমার কথা আর ভাবতে হবে না। হ্যাঁ আমি বিধবা, সোনাদানা

পরি না। তবু সিন্দুকে তো তোলা আছে। তাই জেনে তিনি যেন শান্তি পান। হ্যাঁ আমার শ্বশুর একটা নররাক্ষস। কিন্তু তার অনেক সোনা আছে।

ভাইরা বুঝেছে তাদের বোন খুব অসুখী। তারা অবাকও হয়েছে। এত সোনাদানা, এত টাকা, এত গম-চাল, এত গরু-মোষ, এত বাসন-কোসন, সব পেয়ে বোনের মন ওঠে না কেন? তারা বলে, একটা মেয়ে তুই। তোকে মাস্টার রেখে পড়িয়ে বাবা তোর মাথাটা বিগড়ে দিয়েছে।

আজ দুর্গা শুয়ে শুয়ে সে সব কথাই ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে এক সময়ে তার খেয়াল হল সন্ধ্যা হচ্ছে। আরো খেয়াল হল যে চারদিক যেন বড্ড চুপচাপ।

মোতি! দুলারী! গোপাল কে মা।

কেউ সাড়া দিল না।

কি হল? ব্যাপার কি? তাড়াতাড়ি উঠল দুর্গা। ঘরের আলো জ্বালল।

হঠাৎ যেন অনেক লোক একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। কি করবে দুর্গা? দরজা বন্ধ করে দেবে? না, কোন হইহল্লা নয়। সবাই কথা বলছে। আবার মাঝে মাঝে থেমে থেমে যাচ্ছে। নিশ্চয় অদ্ভুত, অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটেছে।

কে যেন দৌড়ে উঠে আসছে। লম্বা বারান্দা পেরিয়ে আসছে এখন। ঝনঝন শব্দ হচ্ছে। তবে মোতি। মোতি পায়ে কাঁসার মল পরে। মোতি ঢুকল, দুর্গার দাসী।

দুর্গা! সর্বনাশ হয়েছে।

কি হয়েছে? ওরে কি হয়েছে?

হিমুকে…উঃ জীবনে ভাবিনি হিমু মরবে… হিমুকে ধরে ঘোড়ার পিঠে বেঁধে পাঠিয়ে দিয়েছে…হিমুর গলার নলি কেটে দিয়েছে, উঃ উঃ সারা গায়ে শিক পুড়িয়ে ঢ্যারা দেগে দিয়েছে… ঢ্যারা!

চ্যারা দেগে দিয়েছে ?

স্বচক্ষে দেখলাম। আর ·····

কি ?

জিভ কেটে দিয়েছে।

তুই দেখলি ?

হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখেই মালিক বেহোঁশ হয়ে গিয়েছে। ও'র মল্‌হাররা চারজন ভোরবেলা যাবে জঙ্গলে। ও ডাকুকে ধরে আনবেই আনবে।

হিমুকে মেরেছে, গায়ে চ্যারা দিয়েছে!

দুর্গা মুখে আঁচল চাপা দিল। কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টাকে হার মানিয়ে দমকে দমকে হাসি উঠে এল। হাসতে হাসতে দুর্গা বলল। এর চেয়ে ভাল কথা আমি এ বাড়িতে ঢোকার পর এই আঠারো বছরে শুনি নি।

মোতি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করল। শক্রপুরী, শক্রপুরী। কে শুনে ফেলে তার ঠিক কি ?

গণেশ তখন জঙ্গলের পথে দৌড়চ্ছিল জিতা দুসাদের ছেলের হাত ধরে।

ওরা সেই তেঁতুল গাছের কাছে এসে দাঁড়াল।

ভারত দুসাদ বলল, এখনো তুমি যেতে চাও ভাইয়াসাহেবের কাছে ?

হ্যাঁ রে বাবা। নিয়ে চল্।

তবে জেনে রেখো, যদি তোমার মুখ থেকে কোন কথা বেরোয়, তার ফল খুব খারাপ হবে।

জেনে রাখলাম।

খুব খারাপ হবে।

হ্যাঁ রে বাবা।

কত রাগী লোক তা জান না।

বেশ তো, আমার জিভটা কেটে নেবে।

শুধু কি তাই ?

না হয় গায়ে ঢ্যারা দেবে।

কি করে বোঝাই !

গলার নলিটা কাটবে, এই তো ?

আরো কিছু করতে পারে।

দেখা যাবে।

না, পারা গেল না। কি কুক্ষণে আজ বাড়ি গিয়েছিলাম যে। তাতেই তুমি ধরে ফেললে।

আজ আমি যে করে হোক আসতাম।

এখন চুপ কর।

অনেক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শেষে পৌঁছনো গেল ভাইয়াসাহেবের সামনে। ভাইয়াসাহেব একজন ছোটখাট পাতলা মানুষ। গায়ে খাকি জামা, পরণে প্যান্ট। আগুন জ্বেলে ওর চেলারা অথবা সঙ্গীরা মকাই পোড়াচ্ছিল।

এস এস হে গণেশ।

ভারত এবং অন্য সবাইকে বেজায় অবাক করে ভাইয়াসাহেব আর গণেশ পরস্পরকে কোলাকুলি করল।

ভাইয়াসাহেব ! তুমি ওকে চেন ?

হ্যাঁ ভারত। স্কুল থেকে চিনি।

গণেশ বলল, সাকরেদ বানিয়েছ একটি। সারাটা পথ আমাকে ভয় দেখিয়েছে।

কি বলেছে ?

তুমি আমার জিভটা আর নলিটা কাটবে। আর গায়ে একটু ঢ্যাবা দেগে দেবে। এই বলেছে।

ভাইয়াসাহেব বলল, বাঃ !

করবে না কি ?

আরে আমি তো এসব কিছুই করি নি। লোকটাকে ঘোড়া থেকে

ফেলেছি, এখানে এনে কামিয়াদের সামনে বিচারে বসিয়েছি। কামিয়া ছেলেরাই বিচার করল।

ঢ্যারা দিল কে?

এরা সবাই দিল। লোকটা ওদের একসময়ে ঢ্যারা দাগিয়েছে, এরাও দিল।

জিভ কাটল কে?

সোমিয়া ঘাসি বুকে হাত রাখল। হাঁ করল জিভ তার কাটা। তারপর আঙুল নেড়ে বুঝিয়ে দিল, সরকারী আইন হয়েছে, কামিয়া কাজ করব না—এ কথা বলার জন্যে একদিন হিমু তাকে যেভাবে জিভ কেটে দেয়, আজ সে ঠিক সেইভাবে হিমুর জিভ কেটে দিয়েছে।

গলার নলিটা?

মঙ্গল ঘাসি বলল, আমি। আমার বাবার নলি কেটে ও জানোয়ার মারে নি?

বুঝলাম।

ওদিকে কি হল?

সে কথাই বলতে এসেছি। কাল অনেকে আসবে। চারজন বলে শুনলাম। আরো আসতে পারে।

আসুক।

ওদেরও কি মারবে?

গণেশ! এই মারার সিদ্ধান্ত আমার নয়, এদের। এরা বুঝে দেখবে, যা হয় করবে।

হিমুকে দেখে আমি চমকে যাই।

ভয় পেয়েছিলে?

হাবিলদার তো বেহোঁশ হয়ে যায়।

তুমি ভয় পেয়েছিলে?

পেয়েছিলাম।

ভালো। সবাই ভয় পাক। সাধারণ মানুষকে ভয় পায় একটু
ওরা তো অনেকদিন ভয় দেখাল।

আমি ভাবতে পারছি না, এই সব মানুষ, আমার চেনা মানুষ
এ কাজ করতে পেরেছে।

সেজন্যে চেষ্টা করতে হয়েছে। ওদের মধ্যে যে ক্ষমতা আছে, তা
জাগাতে হয়েছে।

ভালো। এখন শোনো, হাবিলদার কার কার জমি নিয়েছে
কতজনকে কত টাকা ধার দিয়ে কামিয়া করে রেখেছে, কতজনকে
মেরে ফেলেছে, সব হিসেব আমি একটা খাতায় তুলে ফেলেছি। সে
খাতাটা জিতা তুসাদের ঘরে রেখে যাব।

তুমি চলে আসতে পার।

কেন?

তোমাকে যদি সন্দেহ করে?

গণেশ হাসল। বলল, আমি তো হিসাব মেটাচ্ছি ওর সঙ্গে, বুঝছে
না? আমার বাবা-মা দাদা-বোন, তাদের মুখের চেহারা ভুলে গেছি
আমাদের চার বিঘা জমিতে ও সবজি খেত করে, তা ভুলে গেছি?

না, ভোলনি।

তোমাকে তো আমিই ওর কথা জানিয়েছি বারবার। যাতে তুমি
একটা কিছু করো।

মনে আছে।

তবে একটা কথা। তোমাকেই শুধাচ্ছি। হিমু তো যার সঙ্গে
যেমন করেছে, তেমনটি পেল।

তাই পেল।

আমি কেন পাব না?

কি চাও?

এই বাঁদরগুলোকে কম পেয়ারা আর আতা খাইয়েছি বাগানের
বেটারা তা মনে রেখেছে?

ভারত হাসতে হাসতে বলল, যদি যে যার জমি পেয়ে যাই, তবে সবাই গাছ লাগাব গণেশ। বছর ধরে ফল খাওয়াব। যত খাইয়েছ, তার দ্বিগুণ খাওয়াব।

আমি চলি। তোমাদের তো কাজ আছে।

হ্যাঁ, যে খবর দিলে, কাজ তো আছেই।

গ্রামে ফিরে গণেশ দেখে, অবস্থা খুব খারাপ। হিমু, মরে গেছে। সবাই হিমুকে নিয়ে ব্যস্ত।

হাবিলদার বলেছে, খুব ভালো করে দাহ করো। ওর নামে আমি মঠ দেব।

তা তো দিতেই হবে।

মাংস পোলাও কামিয়ারা নিয়ে যাক।

কেন মালিক, কেন।

কেউ মারা গেলে রান্না জিনিস খেতে নেই।

গণেশ হাতজোড় করে বলল, মালিক! হিমুর মত বীর আর প্রভুভক্ত লোক আজ নেই, এ আমরা এখনো যেন বুঝতে পারছি না। ওর কথা স্মরণ করার জন্যে এদের জেগে থাকা দরকার। আর, আপনি তো এদের জানেন। এদের রক্ত ফুটছে।

ঠিক বলেছ গণেশ।

খাওয়াদাওয়া চলুক না। নইলে রাত উপোসী থাকলে দেহে বল থাকবে না। কাল একটা যুদ্ধের দিন।

তাহলে তাই হোক। আমি শুতে চললাম। এ আমার অপমান। আমাকে শোধ নিতে হবে। এ খবর যেন বাইরে না যায়। গেলে থানায় সবাই হাসবে। বলবে, হাবিলদার সিং কোনোদিন মানেনি থানাপুলিশ। সব নিজে সামলাতে চেয়েছে। তার ফল হাতে হাতে পেল।

গণেশ বলল, পুলিশ এ কথা বলবে কোন মুখে? পুলিশ তো রামপুর, খারু মানুহাটের খুনের কোনো কিনারা করতে পারে নি এখনো।

মুনিমজী বলল, কিনারা করবে ? তারা বলছে এ হোল রাজপুত জমিদারদের নিজেদের লড়াই। কে তার মধ্যে মাথা গলাতে যাবে ?

হাবিলদার বলল, সে তো জানি। সেজন্যেই আমার এলাকায় পুলিস ঢুকতে দিই না। আমার ক্ষমতা কত, তা সবাই জানে। ভোটের সময়ে আসবে, লাখ টাকা চাঁদা দেব আর জুতোর ঘায়ে কাজ আদায় করব। তিনটে ডেপুটি কমিশনার আমার জবরদখল জমি, আমার কামিয়া এ সব নিয়ে কথা বলতে এসেছিল।

খুব মনে আছে।

মন্ত্রীকে চিঠি পাঠালাম। তিনটেই বদলি হয়ে গেল। এখন আর কেউ আসে না।

কোন লজ্জায় আসবে ?

হ্যাঁ, বছরে কয়েকবার খাসি, ঘি, চাল, এসব ভেট পাঠিয়ে দেব, বাস্। তোমরা তোমাদের মত থাকো, আমি আমার মত থাকি।

খুব ভাল কাজ করেন।

হিমুকে মারার শোধটা নিতে হবে। কিভাবে ঢাবা দেগেছে। ও কি কামিয়া নাকি ?

"ক্যামিয়া নাকি ?" শুনেই মলহার হঠাৎ কি যেন বলতে গেল। গণেশ নিচু গলায় বলল, চুপ চুপ। তুমি যা ভেবেছ তা আমারও মনে হয়েছে। কিন্তু সে কথা পরে হবে। আজ মালিকের মন খুব খারাপ। সে মন আরো খারাপ করে দিও না।

হাবিলদার চলে গেলে গণেশ মলহারের ঘাড়ে হাত দিয়ে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল।

কিছু বোঝ না তুমি ?

কি ?

কামিয়াদের কথা কি বলছিলে ?

তুমি কি ভেবেছ ?

তুমি আগে বল !

আমার মনে হচ্ছে, যে সব কামিয়া ছেলে পালিয়েছে, তারাই এই কাজটা করেছে। হিমু তাদের গায়ে চিহ্ন দাগাত। তারা হিমুকে দেগে দিয়েছে।

এ কথা যদি মনেও হয়, এখন কিছু বোল না। আমাকে যা বললে, বলে ফেলেছ। আর কারুকে বোল না।

ওদের বলব না?

না। ব্যাপারটা দেখা যাক।

কেন, কেন বলব না?

নাঃ! গোপন রাখা গেল না।

কি, বলছ না।

হিমুর নামে শপথ কর যে কারুকে বলবে না?

করলাম।

তাহলে শোনো, হিমু তো মরে গেল।

আর বাঁচে? ঢারা দাগালে বাঁচত, জিভ কাটলে বাঁচত। তাতে মানুষ মরে না। আমরা তো হরদম কামিয়াগুলোর গায়ে দাগাই, জিভও কাটা হয়েছে একজনার। তাতে ওই গরিব আর উপোসী কামিয়াগুলোই মরে নি। হিমু তো জোয়ান আর খুব খানেওয়ালা ছেলে।

যা বলেছ।

ওই যে গলার নলিটা কেটে দিল, তাতেই মরে গেল। গলা কাটলে কি মানুষ বাঁচে? আমি তো তো দেখি নি।

যাক, হিমু আজ নেই। আর হিমু ছিল সর্দার।

এখন তো উধব বসবে সর্দার হয়ে।

কে বলল?

গণেশ মরহারের পেটে কাতুকুতু দিল। বলল, মালিকের মনের কথা হল, তোমাকে সর্দার বানায়।

আমাকে?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

সত্যি বলছ ?

মিথ্যে কথা বলে আমার লাভ কি। আমি তো আর তোমাদের মত লড়িয়ে নই।

আমি হব সর্দার।

তুমিই হবে।

মালিক তাই বলছে।

আমাকে বলেছে।

তবে।

তাই এখন এসব কথা কিছু বোল না কারুকে। আমি যেমন দেখব সময় হয়েছে, তখন বোল।

না না, কাউকে বলব না।

ওদের হিংসে হবে তো।

বুঝতেই দেব না।

চলো, খাবে চলো।

গণেশের ওপর আজ সবাই খুব খুশি। ও বুদ্ধি না খাটালে আজ রাতে সকলকে দুধ খেয়ে থাকতে হত।

গণেশ বলল, ভাই সব! খাও দাও। কাল তোমাদের সামনে মস্ত কাজ আছে।

কাল তো ডাকু দলের শেষ দিন।

আমার মনে হয় তোমরা সবাই যাও।

ছো ছো। এক ডাকু মারতে পুরা ফৌজ।

তবে।

আমরা চারজনই যথেষ্ট।

খেলে ঘুমিয়ে পড়বে না তো ?

না না। ভাঙের সরবত খাব, মাংস খাব, রাত জাগব সকালে গিয়ে ডাকুর ব্যবস্থা করে তবে এসে ঘুমাব।

ওরা যতক্ষণ ভাং খেয়ে, মাংস খেয়ে হইহুল্লা করছে, গণেশ উধবকে ডেকে একপাশে নিয়ে বলল, শোনো, কাজের কথা আছে।

কি কথা ?

মল্‌হারের মাথায় ঢুকেছে ও নাকি সর্দার হবে।

আমি থাকতে ও হবে সর্দার ?

সে তো আমি বুঝি, ও তো বোঝে না।

মারব ওকে। মারব গুলি।

না না। কালকের কাজ হাসিল করে নাও, মালিকের হাত থেকে টাকা নাও, তারপর !

গণেশের ফিচলেমির শেষ নেই। এ কথা ও চাঁদ এবং যোগেনকেও বলল বাকি রাতের মধ্যে। তারপর গিয়ে নিজের বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে হাবিলদার সিং এসে চারজনকে তরোয়াল ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করল। হাবিলদার সিং এ তরোয়াল কখনো বের করে না। অনেক পুরনো এ তরোয়াল। এখনো ধুমধাম করে এ বাড়িতে তরোয়ালটি পুজো করা হয়।

হাবিলদারের চোখ টকটকে লাল, গলা খুব ভারি। সে বলল, এ তরোয়ালের আশীর্বাদ নিয়ে যে একবার গিয়েছে, সে কখনো বিফল হয়ে ফেরে নি।

তারপর বলল, এ তরোয়ালের আশীর্বাদ নেবার পর কেউ কখনো মিছে কথাও বলে নি।

মল্‌হাররা অবাক হয়ে এ ওর দিকে তাকাতে লাগল। উধবের ভুরু কুঁচকে গেল।

তোমরা এই তরোয়াল ছুঁয়ে বলো, আমাকে মারবার জন্যে কোনো চক্রান্ত করছ ? হিমুকে সেজন্যেই মেরেছ কি ? বলো বলো।

না—

কখনো না—

না মালিক—

না, কখনো না—

ভালো, খুব ভালো। দেখো, মিথ্যে বলে থাকো যদি, তাহলে আমি ঠিক ধরে ফেলব। মিথ্যেবাদী আর ষড়যন্ত্রকারীকে আমি ভীষণ শাস্তি দিয়ে থাকি।

হঠাৎ গণেশের মনে হল, এ খুব কুলক্ষণ। বহুকাল আগে হাবিলদারের মাথায় সন্দেহ ঢুকে যায়, সম্পত্তির লোভে তার ছেলে রঘুবীর সিংহ তাকে খুন করবে।

সেই যে সন্দেহ ঢুকল মাথায়, আর সে সন্দেহ গেল না। সেই থেকেই সে ছেলেকে অবিশ্বাস করতে শুরু করে। বছর দুই বাপ-ছেলেতে খুব আড়াআড়ি চলে।

তারপর সে সময়েই হাবিলদার সিং নিজের দেহরক্ষী হিসেবে নিয়ে আসে হিমুর বাবা মন্নুকে। মন্নু হাবিলদারের ঘরে ঘুমাত পর্যন্ত। মন্নু আসার কিছুকাল বাদেই ঘটে এক রহস্যজনক ঘটনা।

বন্দুক যার হাতের বশ, বন্দুক যে চিরকাল নিজে সাফ করে, সেই রঘুবীর সিং হঠাৎ মারা যায় বন্দুক সাফ করতে গিয়ে।

মন্নুরও ছুটি হয়ে যায়। করকরে কয়েক হাজার টাকা নিয়ে সে চলে যায় দেশে।

রঘুবীর মরল, মন্নু ছুটি পেল। এই দুই আর দুই যোগ করে চার করল দেশের মানুষ। দেশেদেশে রটে গেল যে হাবিলদার এক মিথ্যা সন্দেহের বশে নিজের ছেলেকে খুন করিয়েছে।

সে সব কথাই মনে পড়ল গণেশের। প্রাণভয় ঢুকে গেলে হাবিলদার সব রকম নৃশংস কাজ করতে পারে।

মলহাররা চলে গেল। মুনিমজী কাছারিতে বসে খাতা দেখতে দেখতে নিচু গলায় গণেশকে বলল, গতিক খুব খারাপ রে গণেশ। বুঝতে পারলি।

খুব বুঝছি।

কাল রাতে শ খানেক কামিয়া ভেগেছে।

বলতে যাবেন না যেন।

তাই বলি কখনো। আমার বলার দরকার কি। নিজে যখন জানবে তখন জানবে।

জানলে যে কী করবে!

যারা গেল তারা কি করে দেখি।

তোর কি মনে হয় ডাকাত ধরা পড়বে।

সে জানি না। ডাকাত টাকাত ভাবতেই আমার ভর করে খুব। ওরে বাবা!

ওরা চারজন ঘোড়া চেপে বনে ঢোকে। মল্‌হার বলে ভৈয়া! সবাই একসঙ্গে চলো।

কেন।

একসঙ্গে চলাই ঠিক হবে।

আরে ছো ছো। মল্‌হার যে ঠিক বেঠিক বলছে। এ তো খুব তাজ্জব বাত।

বলব না কেন।

তুই বাপু মাথামোটা মানুষ, চুপ করে থাকে।

আজ বলছ, চুপ করে থাক্‌। কাল তো এই মল্‌হারের কথাই শুনতে হবে।

কেন হে মল্‌হার।

আমি তো সর্দার হচ্ছি।

কি বললে।

মালিকের তাই ইচ্ছে।

কে বলেছে?

যেই বলুক।

বল্ কে?

গণেশ, গণেশ বলেছে।

চাঁদ বলল, আমি থাকতে তুমি?

যোগান বলল, হুম বনে সর্দার।

উধব, চুপ কর্ বেতমিজের দল। চিরকাল আমি ছিলাম আর হিমু ছিল। তোরা তো শুধু হুকুম তামিল করতিস।

আজ কি সব পাল্‌টে যাবে?

সেও একটা কথা বটে। কিন্তু—

মালিককে আমি সবচেয়ে ভালো জানি।

তা জানিস।

একটা কাজে এসে নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা করব কেন? গণেশ আমাদের যে কথা বলেছে, তা নিজের বুদ্ধিতে বলেনি। মালিক তাকে টিপে দিয়েছে।

হাঁ হাঁ উধব, তা হতে পারে বটে।

পারবে কেন বাপ, তাই হয়েছে।

তবে?

মালিক কি ভাবছে তাও জানি।

কি?

আমাদের সন্দেহ করছে।

কেন, কেন?

কয়েক বছর বাদে বাদে মালিকের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তখন সে সকলকে সন্দেহ করে।

কি সন্দেহ করে?

তাকে কেউ হত্যা করতে চায়।

যোগান হ হ করে হেসে বলল, ইচ্ছে তো আছে। সুযোগ পাই কোথায়? একদিন মেরে দিয়ে সব টাকা নিয়ে ভাগলে খুব ভালো হয়।

মেরে দেওয়া তো তেমন কঠিন নয়। কঠিন হল টাকার হদিস মেলা। ওর ঘরে সোনাও অনেক।

তা যা বলেছিস।

সে সোনার হদিস জানে ওই গণেশ।

গণেশ আমাদের সঙ্গে খুব বজ্জাতি করল।

তবু তাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার এখন।

হাঁ হাঁ, মালখানার হদিস জানে তো।

যা বলেছ।

মালখানার হদিস বের করে কুচ্ করে—

এ পর্যন্ত কথা বলেই যোগান হঠাৎ আঁক্ শব্দ করে উলটে পড়ল। পথটা একটু ঢালের দিকে। যোগনের পরেই পড়ল উধব। তারপর দুজন। দু গাছের ডালে টান টান করে বাঁধা দড়ি ছিল।

ঘোড়াগুলি হুড়মুড়িয়ে ছিটকে সরে গেল। উধব বেজায় অবাক হয়ে দেখল তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে এ কারা? কামিয়া লোকরা, কামিয়ারা!

বন্দুক উঠা গাধার দল!—উধব চেঁচাল। আর তার হাতে পড়ল প্রবল লাঠির বাড়ি। কে যেন মোলায়েম গলায় বলল, উধব এখনো খোয়াব দেখছে ভাই সব! বন্দুক উঠাবে, মারবে। বন্দুকগুলো যে আমাদের দরকার।

ঝটকা মেরে উঠে পড়ে ওরা। কিন্তু বহুজনের শরীরের চাপ ওদের উপর এসে পড়ে। বেঁধে ফেলে ওরা উধবদের। তারপর টানতে থাকে ছেঁচড়ে।

চাঁদ বলে, তোরা কি করবি?

ভীষণ হিংস্রতায় ভারত বলে, আগে তো ঢ্যারা দাগাব, তারপর দেখা যাবে?

না, না না,—চেঁচাতে যায় ওরা ও গলা চেপে বসে লাঠি? বাজু নাগেসিয়া বলে, বহোত আফশোস যে এদের একটাই জান, এরা একবারই মরবে। একেকজন বিশবার মারলে ঠিক হত। চলো চলো জী তাড়াতাড়ি চলো। কামিয়া কাজ ছেড়ে পালালে গুণ্ডরের

মত তাড়িয়ে তাড়িয়ে আসতে। আর মালিকের কাছে ইনাম নিতে।

মারিস না বাজু।

আরে মরতে এত ভয় কেন? আমাদের তো বছর বছর মারো কয়েকজনকে। এখন গিয়ে দেখ তারা কেমন আছে? মালিকের হাতের পাঁচ আঙুল তোমরা পাঁচজন। হিমু কি একলা থাকবে?

কে যেন বলে, ঘোড়াগুলো জঙ্গলের ওপার দিয়ে বার করে দাও। এদের গাড্ঢায় ফেলে দিও। নয়তো চরে।

উধবরা আর ফেরে না।

হাবিলদার বলে, এখন বুঝলাম ওরা ষড়যন্ত্র করছে কিছু। গণেশ! কালই যাও নওরতসগড়। যত টাকা নেয় নিক। আমি চাই চন্দ্রভান সিংকে। সে আমায় পাহারা দেবে। কি আমিই চলে যাব?

আজও সে অস্থির, পাগল পাগল থাকে। তাই জানতে পাবে না সব কথা। জানতে পারে না যে কামিয়ারা চলে যাচ্ছে দলে দলে। এখন চাষের সময় নয়। ফসল কাটা হয়ে গেছে। তাই কামিয়ারা ক্ষেতে কাজ করছে কি না, সবাই আছে কি না, এখবর সে নেয় না। এ সব খবর কোনদিনই সে নিজে নেয় না। নেবে কেন? নিলে কুড়িজন জোয়ান পুষেছে কেন?

এক খতম, চার ভাগী। আরো চাই তার। অনেক, অনেক গুণ্ডা, অনেক মস্তান। অনেক বন্দুক।

আর হঠাৎ তার মনে পড়ে একটা অসম্ভব কথা। হিমুর দেহে ছিল দশটা চারা চিহ্ন। এ কামিয়াদের কাজ নয়তো? কামিয়াদের গায়ে হিমু চারা দাগ দিত। কামিয়ারা তার শোধ নিল? কামিয়ারা?

হাবিলদার বাকি গুণ্ডাদের ডাকে। ঘোড়ায় চড়ে চলে যাক তারা সকাল হলেই। পঞ্চাশটা দূরদূরান্তের গ্রাম জুড়ে তার জমিজমা, তার কামিয়া বসতি। দুপুরের মধ্যে তারা হিসাব এনে দিক, কতজন কামিয়া আছে কতজন উধাও। যে যে জায়গায় যাবে, কয়েক গ্রাম বাদে বাদে

আছে তার কাছারি। প্রতি কাছারিতে আছে একজন বা দুজন মস্তান। তাদের নিয়ে বেরোলেই হিসাব মিলে যাবে।

সকালে বেরোবে। বুঝলে?

এদের মধ্যে জাঠার বয়েস বছর চল্লিশ। অন্যদের মত সেও জেল-ফেরত আসামী। যারা ডাকাতি বা খুনের জন্যে কোনো কারণে অল্পকাল জেল খাটে, হাবিলদার তাদের নেয় নিজের কাজে।

জাঠাই ওদের বলে, কাল তাহলে আমাদের ডাক পড়ল? কেন? মালিকের পেয়ারের পাঁচ বীর কোথায় এখন?

হিমু তো মরেছে।

ওরা ভেগে গেছে।

আমার মন বলছে নানা কথা।

কি?

পরে বলব।

সকালে ওরা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। গ্রাম ওদের ভাষায় গাঁও, বসতি হল বস্তি।

কোরা গ্রামে পৌঁছয় ওরা জনা সাতেক। সেখানে পৌঁছতে তবে ওরা দেখে কাছারি বন্ধ। কাছারিতে কেউ নেই। সবাই গেছে কোরা নদীর চরে।

কেন।

জাঠারা চলে যায় সেখানে। কোরা নদী এঁকেবেঁকে জঙ্গলে ঢুকে গেছে। আর জঙ্গলে ঢোকার মুখে একটু বালির চরও আছে।

চরে পর পর শোয়ানো চারটি মৃতদেহ। জাঠা দেখে, আর দেখে।

তারপর ওরা ঘোড়ার মুখ ঘোরায়। জাঠা বলে আগে হিমু, তারপর এরা!

মালিককে বলতে হবে না?

যে বলে বলুক, আমি চললাম।

কোথায়?

হাতে বন্দুক, সঙ্গে ঘোড়া। যেখানে হোক কাজে লাগব। নয় ঘোড়া বেচে চলে যাব. ধানবাদ। ঠিকাদার লোকরা বহুত মস্তান রাখে?

পুলিস এ ডাকুকে ধরে ফেলবে আঠা!

পুলিস। মালিক কোনদিন সরকার মানে নি, পুলিসকে ঢুকতে দেয়নি গ্রামে। আজ পুলিস আসে আসুক, যা করতে হয় করুক, আমি চললাম।

চললে?

হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখতে পেলে না?

কি?

একটা গ্রামের লোক আসেনি, শুধু কাছারির লোকজন এসে দেখছে?

তাতে কি হল?

নিশ্চয় কোনো আগুন ধুঁয়াচ্ছে।

তবে?

আমি ওদের মত মরতে পারব না। ওরা পাঁচজন ছিল জবরদস্ত। ধরলাম পুলিস এল, পুলিস ডাকু ধরল। তার আগে তো আমি খতম হয়ে যেতে পারি? মালিক কি আমার জান দেবে? আর যতো বকশিস সব তো ওদের দিত। আমাদের কিছুই দেয় নি। মালিক! তাতেই বাইরে থেকে আরো লোক আনাচ্ছে।

ঠিক বলেছ।

এ একেবারে ঠিক কথা।

মালিকই কিছু দিল না। মালিকের পর তার ছেলের বউ তো ছাই দেবে। সে এসব পছন্দই করে না।

গুণ্ডা, খুনে, বদমাশের থাকে না বিবেকের বালাই। সাতজন গুণ্ডা, তাদের চেয়ে বড় শয়তান হাবিলদারকে ছেড়ে রওনা দেয় অজানার উদ্দেশে। ঘোড়া বেচে দেবে, বন্দুক রইল হাতে। এখন

জমিমালিক, বড় ঠিকাদার, সবাই গুণ্ডা পোষে। কোথাও না কোথাও খুনজখমের চাকরি মিলে যাবে।

জাঠা বলে, পঞ্চাশ টাকা মাইনে, লুঠতরাজদের সুবিধে দেব বলে ডেকে এনেছিল। তা গরিব কামিয়ার ঘর লুঠ করে কি আর মিলত? কোন পয়সার জিনিস মেলে নি।

জাঠা! হমলোগ বনে ডাকু, তু বনে সর্দার?

সবাই হো হো করে হেসে উঠে ও হালকা মনে ঘোড়া চালায়। জাঠা বলে, আর এক কথা। এই অজগ্রামে পড়ে থাকতে ভাল লাগছিল না। শহরে কত সিনেমা, কত হোটেল, কত মজা।

ওরা যতক্ষণ চলতে থাকে, গণেশ পৌঁছে যায় জঙ্গলের মধ্যে। মোটেই যায় না নওরতনগড়ে, মোটেই যায় না গুণ্ডার খোঁজে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, সর্বনাশ হয়েছে।

কি হয়েছে?

বাকি মস্তানরা কামিয়াদের খোঁজে গেছে।

সে তো যাবেই। তাতে সর্বনাশটা কি দেখলে?

সব জেনে যাবে তো?

আর সন্দেহ করেই পাঠিয়েছে।

তাহলে?

সবসময়ে জঙ্গলে এসে শিকার টোপ গেলে না।

কি হবে?

এরা যে যার গ্রামে লড়বে।

কেমন করে?

জানতে পারবে কালকের মধ্যে।

আমার তো ভয় করছে।

আরো কয়েকজন আসুক। তারা বন্দুক চালাতে জানে। তারা এসে গেলেই আমরা বেরোব।

আমি যে কি করি!

বুদ্ধি থাকলে গ্রাম ছেড়ে যেওনা।—ভাইয়াসাহেব একটু হাসে রোশনাইটা দেখে নাও।

দাঁড়াও বাপু, অন্ধকারটা হোক। তখন ফিরতে পারব। লুকোতেও পারব কোথাও।

আর ওদিকে হাবিলদার বুঝতে পারে সে একা নয়, তার সাম্রাজ্যই বিপন্ন।

বহু কামিয়া ছেলে উধাও।

মলুহার, উধব, চাঁদ, মোগন নিহত।

জাঠা, পূরণ, শম্ভু, রতিলাল, কামা, গয়ারাম ও বিছুয়া উধাও কোথাও।

ভীষণ হিংস্রতায় হাবিলদার বলে, এরা বিদ্রোহ করবে। বলোয়া উঠাবে? সব বেটাকে মারব। আগুন জ্বালাব ঘরে ঘরে। এত বড় স্পর্ধা। যা ও তোমরা, মেয়েছেলে, বাচ্চা, বুড়ি যাকে পাও ধরে আনো। আচ্ছা সে চাবুক মারো, গারদ ঘরে বন্ধ করো। কান টানলে মাথা আসে। বেটারা আপনি আসবে।

কামিয়া মেয়েদের ধরে আনবে, হয়তো মেরেই ফেলবে। এ কথা শুনে দুর্গা আর স্থির থাকতে পারে না। মেয়েদের গায়ে চাবুকের আওয়াজ, আর্তনাদ, দুর্গা ভাবতে পারে না।

কি করতে পারে সে? আজ যেন সে নতুন করে বোঝে এখানে সে কি একলা। কি ভীষণ একলা। তীব্র বেগে নেমে আসে দুর্গা। খিড়কির দরজা দিয়ে ছুটতে থাকে অন্ধকারে সেও পেরিয়ে কোরা। আর কোরার কাছাকাছি যত দুসাদ টোলি।

শীতের সন্ধ্যায় রুটি নয়, আটার লিট্টি সেঁকতে সেঁকতে জিতা দুসাদের বউ ও জিতা কথা বলছিল। হঠাৎ সেখানে যেন ঝড়ের ঝাপটায় আছড়ে এসে পড়ে সাদা কাপড় পরা একটি অত্যন্ত ফর্সা মেয়ে। দু চোখে আতঙ্ক, গলায় আতঙ্ক। বলে পালাও পালাও তোমরা। মেয়েদের ধরে নিতে, ঘরে আগুন দিতে আসছে।

কে।

তোমাদের মালিক। অন্যদের বলো, পালাও।—ছুটে চলে যায় মেয়েটি। সে যে ওদের মালিকের পুত্রবধূ দুর্গা, এ কথা জিতা ও তার বউ যেন পরে বোঝে। হতচকিত ভাব কাটতে না কাটতে জিতা চেঁচিয়ে ওঠে, কে কোথায় আছ, ঘর ছেড়ে পালাও।

ওদিকে আগুন জ্বলে ওঠে, আর্ত চীৎকার। নাগেসিয়া বস্তিতে আগুন জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে। বন্দুকের আওয়াজ। হাবিলদার চেঁচাতে থাকে, কৌন ভাগে, হাঁ। আমার বন্দুকের পাল্লা বহুত দূর হয়। কে পালাবে? আয় সব জানোয়ারের দল। বন্দোয়া উঠাবার সাধ মিটিয়ে দিই।

একটা তীব্র, তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা যায়।

হাবিলদার চেঁচিয়ে ওঠে, এ কে। দুর্গা?

দুর্গার কাঁধ থেকে রক্ত ঝরে। দুর্গা দু চোখে আগুন নিয়ে চেঁচিয়ে বলে হাঁ। শয়তান, আমি! মারো মারো আরেকটা গুলি। ছেলেকে খুন করিয়েছে মেয়েছেলে আর বাচ্চাকে মারতে এসেছে—

হাবিলদারকে দেখিয়ে দুর্গা বলে মারো ওকে। ও বেঁচে থাকলে সবাইকে শেষ করবে। খুনী শয়তান।

দুর্গা। এমন কথা বলিস না দুর্গা, তোকে মেরে ফেলে দেব।

মার,..এখুনি মার।—

আর তখনি ওঠে বহু কণ্ঠে ভীষণ চীৎকার। ফসলহীন খেতের ওপর দিয়ে ছুটে আসে মশাল, উড়ে আসে মশাল। ছুটে আসে গুলি। হাবিলদারের ঘোড়া ছুটতে থাকে। সেদিকেও মশাল। নেচে নেচে আসে নেচে নেচে আসে।

আজ মালিক, তোমায় কে বাঁচাবে! অনেক গলায় উল্লাস। মালিকের সন্তানরা পালাতে থাকে।

কিন্তু আজ রাতের যুদ্ধ চট করে শেষ হয় না। কামিয়াদের, দাসদের, অনেকদিনের বিক্ষোভ, অনেকদিনের দুঃখ, আজ হিংসায় জ্বলতে থাকে।

হাবিলদার সিং গুলি খায়, তাকে টেনে ছুঁড়ে ফেলা হয় জ্বলন্ত ঘরে। মর্, দুদাদ-নাগেসিয়ার ঘরের আগুনে মর্। বড্ড জাতের গর্ব ছিল তোর। উঁচু জাতের গর্বে বছর বছর বহু গরিবকে মেরেছিস।

দুর্গাকেও মারত কামিয়ারা। জিতা বলে, না। ও আমাদের সাবধান করে দিতে এসেছিল।

আজ রাতে হাবিলদারের গ্রাম কাছারিগুলিও জ্বলে ছাই হয় পুড়ে যায় হাবিলদারের নিজের কাছারি আর হাজারটা দাসখত ধারকর্জের খাতা।

তারপর সকাল হয়।

কাধের ক্ষতস্থান চেপে দুর্গা পাথর হয়ে বসে থাকে। মরেছে হাবিলদার আর তিন মস্তান, গ্রামের কামিয়ারা পাঁচজন। ভাইয়া সাহেবের লোকেরা টেনে টেনে মৃতদেহ পাঁজা করে। ভাইয়াসাহেব দুর্গার সামনে দাঁড়ায়।

এখন কি করবেন? নালিস করবেন পুলিসকে?

দুর্গা ঘাড় নাড়ে। না। নালিস করবে না।

কামিয়া খাটানো চলবে না, ওরা যে যার জমির দখল নেবে।

দুর্গা ঘাড় হেলায়। তাই হবে।

যদি নালিশ করেন, টাকার জোরে জিতবেন, জাতভাইদের জোরে জিতবেন, তা ভুলেও ভাববেন না। তার আগে অনেক জন মরবে, অনেক লড়াই হবে।

দুর্গা বলে, বুঝেছি।

বুঝবেন, বুঝে চলবেন। এরা শিখে নিয়েছে যে নিজেদের হক নিজেদের রাখতে হয়।

বুঝলাম।

শুধু বুঝলে হবে না। খেয়ালও রাখবেন। আমি কিন্তু আপনার ছেলের খবরও রাখি। আপনি তো চান যে আপনার ছেলে ভালো থাকে।

দুর্গা কোনদিন বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলেনি। এখন কেন
ন তার আড়ষ্ট লাগে না, ভয় হয় না। ভাইয়াসাহেবের দিকে চেয়ে
বলে, ভয় দেখাচ্ছেন কেন? যেদিন অন্যায় করব, সেদিন আপনাকে
য় পাব। এখন তো ভয় পাব না। আমি অন্যায় করব না। অন্যায়
র পাপ আর অত্যাচার দেখে দেখে আমি শেষ হয়ে গেছি।

তবে তো ভালই। কিন্তু ও জমি···কে নেবে···আমি তো কিছুই
নিনা। সে সব কি হবে?

মুনিমজী জানে, গণেশ জানে। তবে তারা সে সব কাজ করবে।
এ গাধাগুলোকে বরখাস্ত করে দিন। এই গুণ্ডাগুলোকে। এখন
একজন ডাক্তার দরকার। এই দলীপ!

ভাইয়াসাহেবেরা সহকারী দলীপ বলে দেখছি। এদিকেও অনেকে
খম তো।

দুর্গা উঠে দাঁড়ায়। তারপর মুনিমজীকে বলে, সব দেখুন। আর
সপাতাল থেকে ডাক্তার আনুন। আগে তো আনতেন। যা
কার করুন। গণেশের উৎসাহ দেখে কে! গণেশ বলে, এখন তুমি
দ সঙ্গে থাকো মা, তাহলে আস্তে আস্তে হাসপাতাল হবে, ইস্কুল
ব, পাকা রাস্তা হবে, স—ব হবে।

দুর্গা বলল, খুব আস্তে বলল, তাই হোক, তাই হোক।

বলতে পেরে তার নিজের স্বস্তি লাগল। সত্যিই, সেই গ্রাম আর
বিলদার সিংয়ের অত্যাচারের রাজত্ব বহুকাল হোল একেবারে বিচ্ছিন্ন
য় আছে ভারতবর্ষের সঙ্গে। সে তফাত ঘুচে যাক, ঘুচে যাক।

গণেশ বলল, তবে আর কি। ঢোল বাজিয়ে দিই। কামিয়ারা
সুক, তাদের জমির দখল নিক।

ভাইয়াসাহেব দুর্গাকে আবার বলল, আর কিন্তু শুধু জুলুম চালিয়ে
জত্ব চালিয়ে রাজত্ব চালাতে পারবেন না।

ভয় দেখাবেন না।

ভাইয়াসাহেব হেসে ফেলল।

এখনকার কথাও নয়, অনেক আগের কথা। আমরা তখন ছো
এ হল শোনা গল্প। কানে শোনা সত্যি গল্প। কেননা সে গ্রাম
দেখেছি, আর স্কুলবাড়ির মুখোমুখি হরি-হর সভাও দেখেছি। ন
"সভা", ব্যাপারটি একটা কাঠের হলঘর। তাতে মঞ্চ আছে, বস
বেঞ্চি আছে। পদ্মাপারের এক দূরের গ্রামে ও রকম একটি র
কাঠের হলঘর চট করে দেখা যায় না। সেখানে থিয়েটার হত, স
হত, ছেলেরা বসে কাগজ পড়ত। এই "সভা" তৈরি নিয়েই গল্প

হরিচরণ আর হরলাল ছিলেন দুই জমিদার। পদ্মার অত কা
কেউ ইটের বাড়ি করত না। নদী ক্ষেপে গেলেই সব ভেঙে তলি
যেত। দুজনেরই কাঠের দোতলা বাড়ি, তা ছাড়া সার সার বড়
খড়ের আটচালা, ধানের গোলা, পুকুর। দুজনের জমিদারি মোট মু
এক মাপের আয়ুও সমান সমান।

ছোটবেলায় নাকি ওঁদের বেজায় ভাব ছিল। বড় হবার
থেকে দুজনের বিবাদ শুরু হয়। ইনি যা করবেন, ওঁর তা করা চাই
গ্রামের মোতি চুনে ছেঁড়া কাপড় পরে ঘুরত। দুজনের রেষারে
ফলে মোতি গরু কিনে অবস্থা ভালো করেছিল।

বাজারে মোতি এসেছিল একটা চালকুমড়ো নিয়ে। এক পয়
পায় তো তাই ভালো। হরিচরণ সেই চালকুমড়ো দেখে বলে
নে, এক পয়সা নে।

নেন বাবু।

হরলাল হাঁকলেন, মোতি, দু পয়সা দেব।

চার পয়সা।

দু আনা (আট পয়সা তখনকার হিসেবে)।

বাজারিয়া লোকজন বুঝল হরিহরের বিবাদ বাধছে। তা

কেনাবেচা শেষ করে দেখতে এল। ততক্ষণে মোতি গামছা ঘুরিয়ে বাতাস খাচ্ছে। হরিবাবু মালকোঁচা মেরেছেন, হরবাবু শূন্যে ছাতা ঘোরাচ্ছেন, চালকুমড়োর দর উঠেছে পাঁচ টাকা। মনে রাখতে হবে তখন দেশগ্রামে এক টাকায় চৌষট্টি সের খাঁটি দুধ মেলে দেড় টাকায় সাঁইত্রিশ কিলো চাল। চালকুমড়োর দর পাঁচ টাকায় উঠেছে শুনে বাজার ভেঙে লোক চলে এল, বড় চৌধুরী দুটো লোককে বাঁশের ছাতা ধরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। হরি আর হরের মাথায় রোদ লাগবে। সন্ধে হয় যখন, তখন চালকুমড়োর দাম উঠেছে পঞ্চাশ টাকায়। বড় চৌধুরী দেখলেন, এদের একজন কিনলে সর্বনাশ হয়। দাঙ্গাই বাধে বুঝি। দুজনের লেঠেল পাইক দাঁড়িয়ে গেছে।

তখন তিনি একান্ন টাকা দিয়ে চালকুমড়োটি কিনলেন। ধমক মেরে বললেন, হরি! হর! চালকুমড়ো কিনবে সে সোনার দরে, একি মামদোবাজি? যাও, যে যার বাড়ি যাও।

মোতি একান্ন টাকা নিয়ে লোকের কাঁধে চেপে বাড়ি গেল। আর বাজারের লোকরা ধামায় সে চালকুমড়ো নিয়ে কীর্তন গেয়ে গ্রামে ঘুরে সকলকে দেখাল।

সব তাতেই ওঁদের বিবাদ। বড় চৌধুরী ছিলেন গ্রামের মাথা। বেজায় সাহসী আর তেজী লোক। স্টীমার কোম্পানীর সায়েবরাও তাঁকে মানত। তাঁর অনুগত ছিল চরের দুর্ধর্ষ মুসলমানরা। একবার তিনি নাকি কলকাতা থেকে গঙ্গাজল আনিয়ে, সে জল ছিটিয়ে গ্রামের তিনটে শ্যাওড়া গাছ থেকে ভূতদের তাড়িয়েছিলেন। ভূতসিদ্ধ ছিলেন। সে-সব ভূতের মধ্যে তাঁর ঠাকুমার ভূতও ছিল।

ঠাকুমা বলেছিলেন, আঁই আঁই চরণ, করিস কি? আমি না তোর কর্তা মা?

আর কর্তা মা! গঙ্গাজল আর রামনামের ঠেলায় গ্রাম সাফ করেছিলেন বড় চৌধুরী।

বড় চৌধুরীর কড়া হুকুম ছিল, গ্রামে মামলা ঢোকানো চলবে না।

ঝগড়া কর, দাঙ্গা কর, মামলা কোর না। সে জন্যেই হরিতে-হরেতে মামলা বাধে নি।

কিন্তু মানুষ তো চিরজীবি নয়। বড় চৌধুরী মারা গেলেন, যাবার আগে হরি আর হরকে বলে গেলেন, গ্রামের অভিভাবক এখন তোমরা, ভাল ভাল কাজ কর।

আজ্ঞে, তাই করব।

তাতেও বিবাদ। সে বিবাদে গ্রামের লোকের লাভই হল। হরি যদি সোনাপদ্মার খালের ধারে শ্মশান যাত্রীদের জন্যে চালা বেঁধে দেন, হর তৎক্ষণাৎ বাজারিয়া লোকের জন্যে তোলেন বড় বড় চালা। ইনি যদি পূজাতে এক গাঁটরি কাপড় বিলোন, উনি বিলোন দু গাঁটরি।

এই সময়ে গ্রামে এসে বসলেন জগন্নাথ মাস্টার। ইয়া হাতের গুলি, রুদ্রাক্ষ, এসেই বললেন, সুচাঁদমোহিনী স্কুলের সামনে একটা ঘর দরকার।

হেডমাস্টার বললেন, কেন?

তাতে সভা হবে, থিয়েটার হবে, কীর্তন হবে। এত বড় গ্রাম, সেখানে একটা হলঘর নেই?

বড় চৌধুরী নেই, কে এ সব করে?

কেন, হরিবাবু আর হরবাবু?

এ সব কাজে পয়সা দেবেন না।

দেখছি

জগন্নাথ মাস্টার থাকতেন বাগচী বাড়ি। বাগচী বাড়ির মদন ছবার ম্যাট্রিক ফেল করে যাত্রার দলে ঘুরছে। মদনকে দলে নিলেন জগন্নাথ।

কয়েকদিন মদন হরিবাবুর বাড়ি খুব যাওয়া-আসা করল। তারপর একদিন আষাঢ় মাসে হঠাৎ হরিবাবুর বাড়ি জগঝম্প বাজনা। হরবাবুর চাকর গিয়ে খবর দিল সর্বনাশ হয়েছে।

কি হল?

হরিবাবুর জন্মতিথির উৎসব হচ্ছে মদন না কি গান বেঁধেছে।

'হরিবাবুর নাম, হরিবাবুর নাম' হরিবাবুর নাম করো হে। তাঁরো কৃপায় তাঁরো কৃপায় হইবে যে হলঘরো হে।

আর হরিবাবু মালা পরে চেয়ারে বসেছে, জগন্নাথ মাস্টার কত ভাল ভাল কথা বলছে, কি খাওয়া দাওয়ার আয়োজন! চালাও ইলিশ মাছ, ভাত আর অম্বল। পাবনা থেকে লোক এসেছে, ফটোক তুলছে।

এ কথা শুনে হরবাবু ক্ষেপে লাল। কি? আমি থাকতে হরি করে দেবে হলঘর!

হাঁ বাবু। হরিচরণ হলঘর।

রাগের চোটে হরবাবু বললেন, দাঁড়াও! জন্মতিথি কাকে বলে তা দেখাচ্চি।

পরদিনই জগন্নাথ মাস্টার আর মদনকে ডাকলেন হরবাবু। বললেন, বেটা আষাঢ় মাসে জন্মে আমায় টেক্কা দিচ্ছে। এই শ্রাবণ মাসে আমার জন্মতিথি করতে হবে। হাম কর দেগা হলঘর। লুচি মাংস খাওয়াব।

উনি যে কথা দিলেন?

ও কি করে দেবে?

হলঘর।

কেন?

এই থেটার হবে। কেত্তন হবে, সভা হবে—

কুছ পরোয়া নেই। আমি বেঞ্চি দেব, মঞ্চ করে দেব আর হ্যাজাক আলো। শতরঞ্চি সব দেব।

লুচি মাংসও খাওয়াবেন?

নিশ্চয়।

তবে আমরা আপনার দলে।

হরগোবিন্দ হলঘর হবে।

নিশ্চয় হবে।

একথা শুনে রাগে কাঁপতে কাঁপতে হরিবাবু বললেন, চললাম আমি পাবনা। আমার পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়ে আমাকে অপমান করা ? মানহানির মোকদ্দমা করে দেব ব্যাটার নামে।

হরবাবু বললেন, আমিও উলটো মামলা ঠুকতে জানি। মামলা কোনদিন করিনি। তাতে কি? ও সারাজীবন আমার মানহানি করে আসছে।

অসম্ভব বিগড়ে গেল কেস। হরবাবুর মা একথা শুনেই দারুণ হেঁকে বললেন, আমি স্নান করতে যাচ্ছি।

হরিবাবুর মা সে কথা শুনেই গামছা নিয়ে বেরুলেন। পুকুরঘাটে গিয়ে হাজির দুজনে। একই পুকুরঘাটে। বড় চৌধুরীদের পুকুর। গিয়ে দুজনে পাশাপাশি বসলেন। বললেন, এত কাল ওর ঝগড়া করেছে, আমরা ভাব রেখেছি, বউরা ভাব রেখেছে। এখন যে মামলা করতে চলল, তার কি করা যায় ?

বড় চৌধুরী গিন্নিও হাজির হলেন। তিনি হলেন মেয়ে মহলে কর্তা। বললেন, নন্দরানী! শশীবালা! তোমাদের ছেলেরা যদি গ্রামে মামলা ঢোকায়, আমি জলে ডুবে মরব। কর্তা থাকতে গ্রামে মামলা ঢোকেনি। সেদিনের ছেলে সব, মামলা করবে। এ অপমান সইব না।

দুই গিন্নি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। বললেন, আমরাও আত্মহত্যা করব দিদি গো!

চৌধুরী গিন্নি বললেন, আসছে বছর নতুন গাছের কাঁঠাল খাব ভেবেছিলাম, তা থাকগে।

দিদি, আমরাও নতুন গরুর দুধ খাব না গো—

এ বছর আর পৌষে পিঠে পায়েস—

ওগো দিদি কেত্তন শোনা থাকল পড়ে—

তিনজনই দুধ-ঘি খাওয়া বিধবা। গলায় পেল্লায় জোর। তাঁদের

ল্লার খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। বুড়োরা বললেন, দেশ ছেড়ে ল যাবে।

হরি আর হব বললেন, যায় যা ইচ্ছে করুন, মামলা আমরা বেই।

সবাই তখন জগন্নাথ আর মদনকে বলল তোমরা সব নষ্টের াড়া। ওরা যদি মামলা করতে যায়, তোমরাও বেরোও গ্রাম থেকে। কি সর্বনাশ!

অবশেষে একই দিনে দুজনে বেরুলেন দুই নৌকায়। যেই কলেন, অমনি চৌধুরী গিন্নি এসে বললেন, নন্দরানী! শশীমুখী! মরা তো রাত পোহালে মরবই। আর বিবাদ তখন পাকা হবে। াজ তবে শেষবারের মত দুই বাড়ি এক হয়ে, যেমন আগে ছিল, আয় াচ্ছব করি।

গ্রামের লোকজন এসে হাজির। বুড়ো বাগচী মশাই বললেন, াঠান! মদন বেটার জন্যই সব সর্বনাশ। বেটা ম্যাট্রিক ফেল করে লে ওর মাথা কামিয়ে স্বপ্নাদ্য তেল মাখিয়েছিলাম। তাতেই বদ দ্ধি গজিয়ে গেল। মদন আর জগন্নাথকেও তাড়িয়েছি। আপনারাও শরীরে স্বর্গে যাচ্ছেন। আজ একটা মহাদিন বটে। মোচ্ছব মরাই করব। সামিয়ানা বাঁধব, খিচুড়ি হবে, কীর্তন হবে। গন্নাথ আর মদনের মাথাও কামিয়ে দিয়েছি। বেটারা মরুক গে।

ছেলেকে তাড়ালে ঠাকুরপো?

গ্রামের ইজ্জত বড়, না ছেলে বড়?

ধন্য ধন্য বাগচী মশাই—সবাই বলল।

তারপর সে কি গণ্ডগোল, কি হইচই! সব বাড়ির মেয়ে বোউ টেনো কুটছে, সব বুড়োরা কীর্তন গাইছে, বড় বড় ডেকচিতে খিচুড়ি পাছে। স্কুল ছুটি দিয়ে মাস্টাররা চলে এলেন। ছাত্ররা স্বেচ্ছাসেবক য়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল। দারোগাবাবু মুসলমান। তিনিও লিস নিয়ে চলে এলেন। স্বদেশী ডাকাত পড়ল কি না দেখতে।

ঘটনা শুনে তিনিও চোখ বুজে বসে পড়লেন। পুলিসরা লাঠি রেখে কাঁসর পিটিয়ে রামা হো রামা হো গাইতে থাকল।

চৌধুরী গিন্নি, শশীমুখী আর নন্দরানী ক্ষীর সন্দেশ খেয়ে সুপুরি গালে ফেলে সভায় বসলেন। হেডমাস্টার বললেন, আহাঃ স্বর্গরাজ্য স্বর্গরাজ্য!

জগন্নাথ আর মদন ছুটল সোনাপদ্মার পাড় ধরে। কিছুতে যেতে দেবে না ওরা হরি আর হরকে। মামলা করতে দেবে না। মাথা কামানোর সঙ্গে সঙ্গে ওদের মনের দুষ্ট বুদ্ধি কেটে গেছে। দুজনে লাঠি ঘুরিয়ে ষাঁড়ের মত চেঁচাতে থাকল, যেয়ো না বলছি, যেয়ো না নৌকা থামাও। আর আগালে সর্বনাশ।

বর্ষার বেলা। আকাশ কালো, দিন অন্ধকার। বাঁশঝাড়ের মধ্যে দিয়ে দুই ন্যাড়া জোয়ানকে ছুটতে দেখে মাঝিদের প্রথমে মনে হল ডাকাত। তারপর মনে হল চরের ডাকাত। তারপর হঠাৎ মনে হল, মদন আর জগন্নাথের মত চেহারা, কিন্তু চুল নেই কেন? এনিশ্চয় অপদেবতা।

দু নৌকোর মাঝিই বৈঠা তুলে নিল। বলল, বাবু! চৌধুরীবাবু নাই, তেনারা জানেন। গ্রাম ছাড়াতেই সঙ্গ নিয়েছেন। আমরা পালালাম।

মাঝিরা ঝুপ ঝুপ জলে লাফিয়ে ডুব সাঁতারে পালাল। নৌকো তো ঘুরতে থাকল বোঁ বোঁ করে। এই সময়ে হরবাবু তাক মেপে লাফাতে যাবেন, হঠাৎ গিচি, গিচি রে! পায়ের গাঁটে টানে ধরল বলে জলে পড়ে তলিয়ে গেলেন।

তবে রে ব্যাটা! মামলা ফাঁকি দেবার জন্যে ডুবে মরছ? —হরিবাবুও ঝাঁপ মারলেন। জলের মধ্যে নাকানি-চোবানি খেয়ে দুইজনেই মরছিলেন, টেনে তুলল মদন আর জগন্নাথ। জগন্নাথ আর মদন দু'জনের ঠ্যাং ধরে শূন্যে ঘুরিয়ে পেট থেকে জল বের করল তারপর এক সময়ে দুজনে চোখ খুললেন।

তখনো তেজ কি? তুজনেই বলছেন, আবার নৌকো নব, মামলা করতে যাব।

এই সময়ে মদন, বয়সে ওঁদের নাতির বয়সী হলে কি হয়, চেঁচিয়ে উঠল, 'চোপ রও!

তারপর বলল, মাথা কামাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে এখন ভয়ঙ্কর তেজ খেলা করছে। মামলার নাম শুনলে তুজনকে ভুরু কামিয়ে ছেড়ে দেব। পরিচয় লুকোবার অপরাধে পুলিশ তুজনকে আন্দামানে পাঠিয়ে দেবে। সেখানে রোজ কয়েদীদের নোনা জলের জালায় চুবিয়ে তোলে, তারপর জংলী বিছে বোঝাই বস্তায় পুরে বস্তার মুখ বেঁধে দেয়। সেই হবে উপযুক্ত শাস্তি।

সে কি মদন? অমন কাজ করবে কেন?

মামলা করবে? আর মামলা হয়? আমরা সাক্ষী দেব, হরকাকা ডুবে মরছিলেন, হরিকাকা প্রাণ তুচ্ছ করে ঝাঁপ মেরে তাঁকে বাঁচালেন। শত্রুকে কেউ বাঁচায়? বাঁচাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কেস কেঁচে গেছে।

সে কি! তাহলে?

আপনারা পরস্পরের কি ছিলেন?

শত্রু। ফাঁচ্। হাঁচি হচ্ছে বাবা।

এখন কি হলেন বুঝতে পারছেন?

জগন্নাথ মাস্টার বললেন, বন্ধু। নিম্ন আদালত থেকে হাইকোর্ট অবধি ওই জল থেকে হরবাবুকে বাঁচানোর সাক্ষ্যে মামলা নাকচ হয়ে যাবে।

হরবাবু রেগে বললেন বটে! তাহলে হলঘর কে করবে, কার নামে হবে?

মদন খুব খারাপ ভাবে ফচফচিয়ে হেসে বলল, তুজনেই সমান খরচ দেবেন, তুজনের নামেই হবে, এবার চলুন। দাঁড়ান, বাঁশ ভেঙে নিই। নৌকোর বৈঠা নিয়ে তো বেটারা পালিয়েছে।

গ্রামে তখন বেজায় হইচই চলছে। হঠাৎ কারা যেন কি চেঁচিয়ে বলতে থাকল, সবাই চুপ করল। তারপর শোনা গেল হেঁড়ে গলায় গান।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। হরিবাবু আর হরবাবু ভিজে কাপড়ে হাত ধরে হেসে হেসে আসছেন। জগন্নাথ মাস্টার আর মদন হাত তুলে গাইতে গাইতে আসছে,

হরি আর হরে মিলন হল হে
মিলন হল!
হর ডুবে মোল, হরি তা দেখিয়ে
ঝাঁপিয়ে পো'ল
মিলন হল!
মামলার কথা তলিয়ে গেল হে
তলিয়ে গেল!

এ দেখে দারোগা বললেন, শোভান্ আল্লা!

পুলিসরা চেঁচাল, বোল সিয়া রামচন্দ্র কী জয়!

আর জগঝম্প-শিঙে-খোলকরতাল সব একসঙ্গে বেজে উঠল।

চৌধুরীগিন্নি মুচকি হেসে বললেন, আর কোনদিন বিবাদের কথা শুনেছি তো দুটোর মাথা আমিই মুড়িয়ে দেব। যাও শুকনো কাপড় পরে সভায় এসে বস।

এমনি করেই গ্রামে আদায় হল হরি-হর সভাগৃহ। পুজোর সময়েই সেখানে থিয়েটার হল। ছাঁট কদম চুলে পাগড়ি বেঁধে জগন্নাথ আর মদন রাণা প্রতাপ আর কে যেন সেজে সে কি যুদ্ধ করলেন লাফ মেরে মেরে। শালকাঠের তক্তা না হলে মঞ্চটা ভেঙেই যেত।

একশো ছাব্বিশ বছর আগেকার কথা। ১৮৫৫ সাল। বীরভূমের এক জায়গা, নাম ধরো লালপুর। সেখানকার মাটি যেন রক্ত ঢালা, আর বসন্তকালে পলাশ ফোটে আগুনলাল রঙা।

লালপুর জায়গাটাকে খুব বড় গ্রাম বললে ঠিক হয়। গ্রামের জমিদার মদন রায়দের একতলা বাড়ি। বেশ বড় বাড়ি। বাড়ির সামনে পুকুর আছে, আছে বাগান। আর আছে মস্ত শিব মন্দির। মন্দিরের ঘণ্টাটা খুব উঁচু। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বেশ শক্তি দিয়ে দোলা দিলে শিকলে বাঁধা ঘণ্টা বাজে।

১৮৫৫ সালের আগেই সাঁওতাল প্রজারা বেজায় ক্ষেপে উঠেছিল। কেনই বা ক্ষেপবে না বল? যত জমিদার, যত মহাজন, সবাই তাদের ঠকাতে লেগেছিল।

বুধনি এক সাঁওতালনি। বুড়ি হয়ে গেছে সে, চুলগুলো ধবধবে সাদা। মদন রায় তাকে 'দুধ' মা বলে ডাকে। মদন রায়ের জন্ম হল, তার মা মরে গেল। অতটুকু ছেলে মায়ের দুধ ছাড়া কি বাঁচে? শেষে ছেলের ঠাকুমা বুধনিকে বলল, ওরে মেয়ে! এখনকার মত ওকে দুধ দে। ও বাঁচুক। তোরা অবশ্য বুনো জংলী জাত। তোর দুধ খেলে ওর জাত থাকবে না। তা সে পরে দেখা যাবে।

বুধনি ছেলেটাকে নিয়ে চলে যায়। তার দুধ খেয়ে ছেলে যখন বছরেরটা হল, তখন ওাকে নিয়ে চলে এল ঠাকুমা। কিন্তু বুধনি ও বাড়ির 'দুধ মা' হয়ে রইল নামে।

১৮৫৫ সালে তো সাঁওতালরা যুদ্ধে নেমে গেল। অনেক সয়েছি আমরা। কত অত্যাচার করেছ তোমরা।

আমরা বিশের বেশি গুনতে জানি না। বাবু! মদনবাবু!

তোমার কাছে ভাদ্র মাসে পাঁচ সের চাল নিয়েছি। তুমি বলেছ অঘ্রাণে পৌষে বিশ সের চাল ফেরত দিবি।

তাই নিয়ে গিয়েছি।

তোমার নায়েব সব ধান চাল ঢেলে নেয়, আর বলে, এই হল পাঁ সের, এই হল দশ সের।

আমরা কাতর হয়ে বলেছি, বাবু! বিশ বল্!

নায়েব বলেছে এনেছিস পাঁচ সের. বিশ সের বলব কেমন করে

আমরা ছুটে গিয়ে সব ধান-চাল সর্ষে কলাই এনে দিয়েছি পাহাড়ের মতো উঁচু করে ঢেলে দিয়েছি। তবু নায়েব বলেছে, না বিশ সের হল না।

তখন আমরা বলেছি. বাবু! ধার শোধ হল না?

না!

বাবু! মদনবাবু! সাওতাল দুধ নায়ের দুধ ছেলে তুমি। তুমি বলেছ, না! ধার শোধ হল না। ধার শোধ করিসনি যখন, তখন এই কাগজে বুড়ো আঙুলের ছাপ দে।

ছাপ দিলে কি হবে?

যতদিন ধার থাকবে, ততদিন আমার জমিতে খাটবি।

তোমার জমিতে খাটতে খাটতে আমাদের জমি কবে যেন তোমার জমি হয়ে গেছে।

এমন ধারা জুলুম যে কত সয়েছি তার কি শেষ আছে? তাই তো আমরা 'হুল্' ঘোষণা করেছি।

জমিদার মহাজন পুলিস, স-ব হঠাব। সকলের মাথা নিব বাধ দিলে

আমাদের ক্ষেতজমি, ধান চাল দিব না।

তোমাদের দাস হয়ে খাটব না।

তোমাদের ভাষা বুঝি না বলে নতুন নতুন আইন দেখিয়ে নয় নতুন জুলুমবাজি সইব না।

খুব লড়াই বেঁধেছিল। হাজার হাজার সাঁওতাল তীর ধনুক টাঙি
নিয়ে নেমে পড়েছিল।

আর বড়লোকদের কি ভয়, কি ভয়। এই ধরল বুঝি, এই মারল
ঝি, তারা ভয়ে মরে।

লালপুরের সাঁওতালদের সর্দার বুধনির ছেলে ভীম মুর্মু। ভীম
বলল, মা! মদনটাকে কাটি দিব।

একেবারে কেটে ফেলবি?

তা এখানে ওখানে সবাইকেই কাটছি যখন, ওটাকে বাঁচিয়ে রাখা
ক হয় না।

তার আর আমি কি বলব? তবে —

কি?

সে যদি আগেভাগে প্রাণভিক্ষা চায়?

ভিক্ষা দিব না!

ভীম! দুধ তো সেও খেয়েছিল। সে যদি প্রাণভিক্ষা চায় তবে
প্রাণ বাঁচানো আমার ধরম হয়। হয় কি না হয় তুই বল?

মা! এ বড় গোলমেলে কথা।

চল নায়কেরে শুধাই।

নায়ক হলেন পুরোহিত। দশখানা গ্রামের নায়ক বুড়ো ভৈরব
বন বললেন, সাঁওতাল জাতির একটা ধর্ম পথ আছে। মদন রায়
বুধনির পা ধরে প্রাণভিক্ষা চায়, তাহলে জীবনমরণ বুধনির হাতে।

কেমন করে?

তুই ভীমের মা। তোর সম্মান আছে একটা। তুই যদি শক্ত
থাকিস, বলিস যে না বাছা! প্রাণটি তোমায় দিতে পারব নাই,
সে মরল।

যদি 'হাঁ' বলে বসি?

তখন তো প্রাণটা দিতে হয়। 'হাঁ' তুই বলিস না বুধনি।
কটা বড়ই মন্দ।

আচ্ছা।

'হ্যাঁ বলব না, কোনো মতে বলব না' জপতে জপতে বুধনি ঘ
ফিরল।

কিন্তু পরের দিনই সাত সকালে মদন রায় ছুটতে ছুটতে এসে বুধনি
পা জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, নায়েবকে আমার হাটের মাঝে কে
ফেলেছে বুধ মা! নায়েবটা ছিল মহাপাজি। তোর জাতের লোকদে
ঠকিয়ে সুদ নিত কত। তাকে একেবারে টাঙ্গির কোপে উড়িয়ে দিয়েছে
মা গো! জন্মকালে প্রাণ বাঁচিয়েছিলি, এখন আরেকবার বাঁচা।

বুধনি সব ভুলে গেল। সে বলল, প্রাণটা তোর বাঁচাব
আমার ছেলে ভীম আমায় ক্ষমা করবে?

বাঁচা আমাকে। যা বলবি সব করব।

নায়েবটা সুদ নিত জুলুম করে আর তুই কি করতিস? তো
জোরেই তো নায়েবটা বজ্জাতি করত।

সুদের টাকা ফেরত দিব।

কাগজগুলো যে আমাদের গলার ফাঁস?

সেগুলা পুড়াব।

জমিগুলা নিয়ে নিয়েছিস যে?

স--ব দিয়ে দিব।

নায়েবের মাথা বর্শার ফলকে গেঁথে ভীমরা এসে পড়ল। হুল মাহ
হয় এটা, হুব মাহা! নায়েব গেছে।

জমিদারটাকে কাটব। হুল মাহা এর নাম।

বুধনি ভীষণ চীৎকারে বলল, না।

ভীম বলল, ছি ছি মা! তুই 'হ্যাঁ' বললি?

আমি 'হ্যাঁ' বললাম রে ভীম!

মা! তোকে এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে ওই শয়তানের মাথা তে
আমি এখনি নামাতে পারি। কিন্তু মা। তুই আমার মা! তো
কথাটা রাখা আমার ধরম হয়। আমি এখন কি করি মা?

নায়েবটা তো আসল শয়তান নয়। সে যার চাকর, যে তাকে চালাতো, সে তো এখন তোর কাছে প্রাণ চেয়ে নিয়েছে। আঃ!

তোর কাজ দেখে আমার বুকটা আমার ভেঙে যাচ্ছে রে মা।

ভীম শোন্! তোরা সবাই শোন্! তোরা এর ঘরটো হানা দে, সুদের কাগজ পুড়িয়ে দে, আমাদের ধান চাল ফিরত নিয়ে নে, জমিন সব আমাদেরই হল। ফকির করে ছেড়ে দে ওকে। কিন্তু জানে মারিস না।

তুই যা বলিস, স ব করব মা! কিন্তু কাজটা ভালো হল না। কালকেউটার কোমর ভেটে ছেড়ে দেয় কে, বল্? তারে জানে মারে।

অন্য সাঁওতালরা বলল, যা হবার তা তো হল রে ভীম!

এখন চল্ কোমরটা তো ভাঙি।

মদন রায়ের বাড়িব সকল মানুষকে পথে বের করে দিল ভীম। ধান-চাল সব তুলে নিয়ে গাই বাছুর ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে আগুন দিয়ে দিল।

বলল, কাগজ পুড়াব, তাতে কি ও জব্দ হয়! দে বাড়ি জ্বালিয়ে। পাপের বাড়ি আগুনে যাক।

মদন রায় আর তার লোকজনকে বলল, যা যা, যেথা যা ব যা। থাকলে পরে মরবি আর কারো হাতে। তোকে দেখলে আমিই মায়ের কথা ভুলে যাব।

একটা গরুর গাড়ি পেতাম!

যা যা, হেঁটে যা। আমাদের কোমরে দড়ি পরিয়ে হাঁটিয়ে শহরে থানায় নিতিস না?

মুখ কালো করে মাথা হেঁট করে মদন রায় পা বাড়াল। ভীম ভীষণ গর্জনে বলল, থাম্।

কি বলছিস?

মায়ের পা ধর্।

ধরেছি।

পায়ে মাথা রেখে বল্ কোনো বেইমানি করবি না। পুলিস নিয়ে আসবি না।

কোনো বেইমানি করব না। পুলিস নিয়ে আসব না। কথা দিলাম।

যা বেটা!

এক লাথি মারল ভীম। গড়িয়ে পড়ে তারপর উঠে প্রায় দৌড়ে মদন রায় চলে গেল গ্রাম ছেড়ে।

সাঁওতালদের সমাজে সব নিয়ম শৃঙ্খলা মতো কাজকর্ম। ভীম বলল, বুড়ো বুড়িতে মেয়েরা যেমন পারিস চাষবাস কর গে। আমরা চললাম লড়াইয়ে। আর মা! তোর ওপর ভার রইল।

কিসের ভার?

শহর হতে আসবার পথ হয় লালপুর। আমাদের ছেলেরা এই চারপাশে জঙ্গলে থাকবে। পুলিস আসে, কি জমিদারের লোকলস্কর আসে, ঘণ্টাটা বাজাবি। নিজে না পারিস, কারুকে বলবি, তারা বাজাবে।

খুব পারব।

ভীমর চলে গেল সাজো সাজো—মারো মারো রব তুলে।

হুলমাহা হয় এটা। রক্তে বড় মাতন গো! জমিদার নেই, মহাজন নেই, স—ব এখন আমাদের।

হুল মাহার মাতনে লালপুরের মানুষগুলি ধান ক্ষেতে নেমে পড়ে। এবার ফসল বুনে কি সুখ, কি শান্তি। বছর বছর ফসল বোনা হয়। ফসল তুলে দিতে হয় মদন রায়ের গোলায়। এবার যে যার ফসল যে যার গোলায় উঠাব, বড় সুখ গো, বড় শান্তি!

আবার যতো পালা-পরব আছে স— ব হবে। মা-মড়েঁকো, মাঘেসীম্, সারহুল, করম, শহরায় পরব। কত নাচ-গান, কত খাওয়া দাওয়া।

হুলমাহা আগুনে পাপ পুড়ে যাক, দূরে যাক। আবার শান্তি নামুক সাঁওতাল বসতিতে।

মদন রায়েদের ভিটা অনেকদিন পোড়া-ঝোড়া হয়ে রইল।

তারপর বর্ষার জল নামতে চারদিকে ঢেকে গেল সবুজ ঘাসে। আকাশ কালো করে মেঘ ছুটে এল। এমন বৃষ্টিতে ছেলেরা মাঝে মাঝে জঙ্গল ছেড়ে গ্রামে আসতে থাকল।

কখনো হরিণ বা শুওর মেরে আনে তারা। কখনো নিয়ে আসে বুনো জাম।

এমন এক বর্ষার দুপুরে বুধনি গিয়েছিল গ্রামের প্রান্তে তার বোনের বাড়ি। বোন বলল, এখন থাক্। দুজনে খাইদাই, গল্প করি।

সাঁঝ লাগতে বুধনি ঘরের দিকে রওনা হল। একটা টিলায় উঠে টিলার গা দিয়ে নামলে সহজে পৌঁছানো যায় বাড়ি।

বুধনি টিলায় উঠল।

তখনি সে ওদের দেখল।

মদন রায় আর আরো ছয়জন লোক ঘোড়ায় চেপে আসছে। বুধনি টিলার পাশে একটু নেমে এক গোছা ঘাস আঁকড়ে বুকের দুপদুপানি থামাল। ওদের কথা বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ভীম আর অন্য জোয়ান ছেলেরা গেছে পাকুড়ের দিকে।

ঠিক বলছ তো? নিশ্চয়। এ গ্রামে সবাই বিদ্রোহী?

নিশ্চয়। ধরবে, ফাঁসি দেবে কয়েকটাকে। তারপর মোটা বখশিস দেবে সায়েবরা। তুমি নিজেও বখশিস নেবে তো?

কেন নেব না? আমি তো তোমাদের পথ দেখিয়ে এনেছি।

লড়াবুঝা নেই তো?

না না, কে থাকবে? কয়েকটা বুড়ো-বুড়ি, কিছু মেয়েছেলে আর কাচ্চা বাচ্চা।

ভীমের কেউ নেই? বিদ্রোহী নেতার কোনো আত্মীয়কে ধরলে মোটা টাকা পাব।

ভীমের মা আছে। বোকা সাঁওতাল বুড়িটা আমায় দুধছেলে বলে। সেটাকে ধরবে।

বুধনি আস্তে নামল। তারপর প্রায় জীবজন্তুর মতো নিঃশব্দে ছুটে

চলল ঘাসবন দিয়ে। কোনো মতে যেতে হবে, পৌঁছতে হবে মন্দিরে
ঘণ্টাটা বাজাতে হবে। অন্য কেউ হলে ভাল হত। কিন্তু অন্য কে
নেই। আর, মদন রায়কে বাঁচিয়ে রেখে বুধনি এই বিপদ ডে
এনেছে আজ। ঘণ্টা বাজাবার দায়িত্বও তার, তার একার। সে যে
ভীমের মা। ভীম তো হুলমাহার এক সর্দার। বুধনি কি করবে?

বুধনি শিবমন্দিরে পৌঁছে গেল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উ
শিকলটা ধরে ঝুলে পড়ল। ওর শরীরের ভারে, বর্ষার বাদলা বাতা
শিকল দুলল, ঘণ্টা বাজল, শিকল দুলল, ঘণ্টা বাজল, বেজে চলল।

ছেলেরা দৌড়ে আসতে থাকল। ঘণ্টা বাজে কেন, কেন ঘণ
বাজে? দুলতে দুলতে বুধনি বলল, আমায় নামা।

ওকে নামাল ওরা।

ধনুক উঠা, তৈরি থাক। ঘোড়া চেপে মদন রায় আসে। আমা
ধরবে, বখশিস নিবে। গ্রামে জোয়ান নাই কেউ, শুধু বুড়া-বুড়ি, এ
জেনে আসে। যা তোরা, কতজন আছিস?

তুই দেখ্‌না কেন বুধনি মা। আমরা তোর দশ ছেলে হই, দে
বেন তুই?

ছড়িয়ে পড়ল ছেলেরা, বুধনি লুকিয়ে পড়ল ঝোপের পাশে
লুকাতে লুকাতে বলল, দুধছেলেটাকে আগে কাঁদবি, সবার আগে।

চাপা গলায় হাসল একজন। বলল, বুধনি মা। তোর ধরমা
গেল কোথায়?

বুধনি ফিশফিশ করে বলল, ধরমের কাজটাই তো করতে বলল
রে। হুলমাহার ধরম আমার পুরনো ধরমের চেয়ে আরো বড়
আগে বুঝি নাই রে।

মদন রায়রা দেখা দিল। ছেলেরা ধনুক তুলল।

হুলমাহা চলছে, হুলমাহা। বুধনি জানতে পারল না হুলমাহা
গল্প চিরদিনের গল্প হয়ে যাচ্ছে। সত্যি ইতিহাসটা এখানে, লালপুরে
মাটিতে লেখা হচ্ছে।

ভূতানন্দ কলোনি

পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষ এসে কলোনি গড়ে তোলার কথা তোমরা সবাই জান, কিন্তু ভূতানন্দ কলোনির কথাই জান না। জানবার কথাও নয়। কম করে দুশো বছর আগেকার ঘটনা তো। আমি গল্পটা শুনেছিলাম এক বুড়োর কাছে। বীরভূমে। গল্পটা অবশ্য বুড়োর ঠাকুরদার যিনি ঠাকুর্দা তাঁর বাপকে নিয়ে।

সীতানাথ মুখুজ্জে তাঁর নাম। গরিবের ছেলে, লেখাপড়া জানতেন, হিসেব রাখতে পারতেন। মোটে কাজকর্ম পান না। সে দুশো বছর আগেকার কথা ১৭৭৯ সাল-টাল হবে। সংসারে তিনি আর মা। শেষকালে মামা বললেন, আমি যে জমিদারের কাছে কাজ করি তাঁর কাছারিতে তোকে কাজ ঠিক করে দিলাম। ওঁর একটা গ্রাম আছে, ভূতানন্দ নাম। বিদঘুটে নাম কেন?

তাতে তোর কি রে? মাসে মাসে পাঁচ টাকা মাইনে পাবি। কাছারি বাড়িতে থাকবি। একটি পয়সা খরচ হবে না।

তখনকার পাঁচ টাকা এখনকার হাজার টাকার চেয়ে বেশি বই কম নয়। সীতানাথ বললেন, এত টাকা মাইনে কেন?

জমিদার যে খুব ভালো। গ্রামের লোকেরা যে কত ভাল তা বলতে পারি না। শুধু একটা কথা।

কি?

নদীর ঠিক ওপারে জমিদার মশায়ের একটা বাড়ি আছে। কালীপুজোর দিন বিকেলে তোরা সেই বাড়িতে চলে আসবি। পরদিন সকালে ফিরে যাবি। এ কথায় স্বীকার হতেই হবে।

সীতানাথ ভাবলেন, জমিদারদের কত রকম খেয়াল থাকে, এ হয়তো একটা খেয়াল। বললেন, তাই হবে।

ভূতানন্দ গ্রামে এসে সীতানাথ আর তাঁর মা তো তাজ্জব বনে

গেলেন। চমৎকার বাড়ি তাঁদের। অজয় নদের ধারে দোতলা মাটির বাড়ি। গোয়ালে গরু, বাগানে তরি-তরকারি, ফুলের গাছ। চাকর-দাসীরা সব কাজ করে দেয়।

গ্রামের লোকরা এত ভালো, যে তেমনটি দেখা যায় না। গ্রামের মোড়ল বলল, এত সেবাযত্ন করি, তবু নায়েব হয়ে যাঁরা আসেন, তাঁরা চলে যান।

কি আশ্চর্য!

আমাদের একটা নিয়ম আছে বাবু।

কি নিয়ম শুনি?

মোড়ল লজ্জা—লজ্জা মুখ করে বলল, হাটে গিয়ে সবাই সব বেচি তো? তা যার ঘরে যা হয়, আপনাদের দিয়ে তবে বেচতে যাবে। তাতে আপনি রাগ করবেন না।

এ তো ভাল কথা।

সীতানাথ আর সীতানাথের মা তাজ্জব হয়ে গেলেন কাণ্ডকারখানা দেখে। তাঁতি এসে কাপড় দিয়ে যায়। গয়লারা দেয় দই, দুধ, ঘি। কুমোর দেয় মেটে কলসি, হাঁড়ি। গুড় বল, তেল বল, কিছুই কিনতে হয় না। সীতানাথের মাইনের টাকা জমতেই থাকল।

কিছুদিন বাদে সীতানাথ তাঁর বিধবা দিদি আর বোনপো বোনঝিদের নিয়ে এলেন। এক বুড়ো কাকাও খোঁজ পেয়ে হাজির হলেন। গ্রামের মোড়লও খুব খুশি। সীতানাথ তো রাজার হালে আছেন। মাছ খাচ্ছেন, ঘি-দুধ খাচ্ছেন, মহানন্দে কাজ করছেন। জমিদারও খুশি।

সীতানাথের দিদি একদিন বললেন, আচ্ছা, চাটুজ্জে মশায়ের গিন্নি কি পাগল না কি?

মা বললেন, কেন?

ওঁর মেয়েটি সীতানাথের বউ হলে বেশ হয়। সে কথা বলতে উনি বললেন, ওমা! বউ যে বরের চেয়ে বড় গো! এ কেমন কথা

বললেন ? ওঁর মেয়ের বয়স বড়জোর দশ বছর। সীতানাথের বয়স তো পঁচিশ। পাগল না হলে কেউ এমন কথা বলে ?

দরকার নেই বাপু। মা পাগল হলে মেয়েও পাগল হবে। তার চেয়ে গাঙুলীদের মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হলে বেশ হয়।

সীতানাথের দিদির তো কোনো কাজই নেই। দাসীরা এসে সব করে কর্মে দেয়। উনি শুধু রাঁধেন। সময় অনেক। উনি দুপুরে গেলেন গাঙুলী বাড়ি। জমিদারের নায়েব সীতানাথ, ইনি সীতানাথের দিদি। গাঙুলীগিন্নি মাদুর পেতে বসালেন, কথা বললেন।

বিয়ের কথা শুনে গাঙুলীগিন্নি বললেন, সে কি হয় ? বরের চেয়ে বউ যে বয়সে বড় হবে।

সীতানাথের দিদি বাড়ি এসে মাকে বললেন, এ গ্রামে সবাই পাগল মা। এ গ্রামে ওর বিয়ে দিয়ে কাজ নেই।

এমনি করে কালীপুজোর অমাবস্যা এসে পড়ল। মোড়ল বলল চলুন বাবু। নৌকোর পর নৌকো সাজানো আছে। হেঁটে চলে যাবেন। ওপারে আপনাদের থাকার বাড়িতে সব ব্যবস্থা আছে।

মা, দিদি, দিদির ছেলেমেয়েকে নিয়ে সীতানাথ বিকেলে গেলেন ওপারে। চমৎকার বাড়ি। ঘরে ঘরে বিছানা পাতা, মশারি টাঙানো। রাতে খাবার জন্যে খাসা ক্ষীর, রসগোল্লা, মুড়কি আর কলা। কুঁজোয় খাবার জল। ঘরে ঘরে পিদিম। সন্ধ্যে হতে সবাই ঘরের বারান্দায় পিদিম জ্বেলে দেওয়ালির আলো দিলেন। তারপর খেয়েদেয়ে সবাই শুতে গেলেন। সীতানাথ বাড়ির বাগানে বেড়াচ্ছেন। ওপারে গ্রাম দেখা যাচ্ছে।

রাত যেমন ঘনিয়েছে, সীতানাথ দেখেন, মশাল জ্বেলে বহু লোকজন নদীর ধারে আসছে। ডাকাত না কি ? তারপর দেখেন, মশালগুলো নদীর ধারে সারসার পুঁতে সবাই যেন কি করছে। ভাল করে চেয়ে দেখেন, কাছারি বাড়িতে পিদিম জ্বলছে সারে সারে।

সীতানাথ ঘাবড়ে গেলেন। কাছারিতে আছে জমিদারী কাজকর্মের

খাতাপত্র। সেগুলোর দায়িত্ব তাঁরই। কি হবে? বাইরের লোকজন বা গ্রামের লোকজন কাছারিতে ঢুকেছে নিশ্চয়। বেশ করে গরম চাদরে কান মাথা জড়িয়ে সীতানাথ রওনা হলেন। মামার নিষেধের কথা তখন আর তাঁর মনে নেই।

নৌকো দিয়ে হেঁটে এপারে এসে পৌঁছে যা দেখলেন, তাতে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ।

গ্রাম শুদ্ধ, মানুষ, ধড় থেকে মুণ্ডুগুলো নামিয়ে জলে ভাল করে ধচ্ছে। মুণ্ডুগুলো পরস্পর কথা বলছে।

গাঙুলীগিন্নির মুণ্ডু বলছে। ছেলেটা তো ভালই। কিন্তু ওদের তো আর সত্যি কথা বলতে পারি না।

চাটুজ্জে গিন্নির মুণ্ডু বলছে, এ কথা কি বলা যায়?

মোড়লের মুণ্ডু বলছে, বলার দরকার কি? আটত্রিশ বছর আগে গ্রামে বর্গীরা এসে সকলের মুণ্ডু কচাকচ কেটে রেখে গেল। সে গ্রাম ছেড়ে এসে আমরা ভূতানন্দ গ্রাম পত্তন করেছি। সারা বছর ওনাদের মত থাকি, চলাফেরা করি। এই একটা রাত আমাদের। মুণ্ডু ধোব। স্নান করব, মা কালীর ভূতপেতনির সঙ্গে একটু মুণ্ডু হোঁড়াছুঁড়ি করে বল খেলব, বাস!

মোড়লের ছেলের মুণ্ডু বলছে, আগেকার নায়েবগুলো কথা শোনেনি। আমাদের দেখে ভয় পেয়ে পালাল!

এ পর্যন্ত শুনেই সীতানাথ অজ্ঞান হয়ে নৌকোর ওপর পড়ে গেলেন। যখন জ্ঞান হল, তখন তিনি কাছারিতে। মোড়ল মাথার কাছে বসে। ওঁকে উঠে বসতে দেখে মোড়ল নিশ্চিন্ত হল! সীতানাথ সভয়ে চাইলেন। মোড়ল বলল, না বাবু, এখন মুণ্ডু ধড়েই লেগে আছে।

তোমরা সবাই ভূত? যা বলেন বাবু।

কি সর্বনাশ!

সর্বনাশ কিসে? জেনেই গেছেন যখন, তখন বলি বাবু! বছরে একটা দিন আমাদের ঘাঁটাবেন না। এ টুকু পারবেন না? ওই একটা

দিন আমরা একটু আমোদ করি। বাকি দিনগুলো? বলুন দেখি, কি আরামে রাখি আপনাদের?

তা রাখো বটে।

তবে আর কি! ও দোষটুকু ক্ষমা করে নিন বাবু। এখানেই থাকুন। এমন সুখ আর আরাম আর কোনো গ্রামে নেই।'

গাঙ্গুলীমশাই বললেন, আর একটা কথা। বিয়ে করুন আপনি। আমার মেয়ের তখন বয়স ছিল এগারো. এখন তার বয়স উনপঞ্চাশ। গ্রামে সবাই আপনার চেয়ে বয়সে বড়। চাটুজ্জেমশাই বললেন, আমার বয়স তো একশো এক হল। দেখলে বোঝা যায়? হুঁ হুঁ বাবা, দেখলে সবাই বলবে তেতাল্লিশ বছর। আপনি কি একবারও টের পেয়েছিলেন, আমি আটত্রিশ বছর আগে টেঁসে গেছি? সত্যি কথা বলুন তো? আজ্ঞে না, বুঝিনি।

তবে আর কি! থেকে যান।

থেকেই গেলেন সীতানাথ। থাকলেন, বিয়ে করে বউ আনলেন। তারপর যখন বুড়ো হলেন, ভুতানন্দের লোকেরা এসে ধুমদাম করে তার নিজের গ্রামে বাড়ি তুলে দিল একটা।

এ গ্রামেও তারা আসত, এটা-সটা দিয়ে যেত। কিন্তু সীতানাথের পরে তেমন কোনো ভালো নায়েব পাওয়া যায় নি।

সেই দুঃখেই ভুতানন্দের মানুষ কিংবা ভুতরা একদিন গ্রাম ছেড়ে কোথায় উপে গেল। সম্ভবত অন্য কোথাও কলোনি গড়তে গেল। কোথায় যে গেল, এখনো তাদের খোঁজ মেলেনি। সীতানাথ কিন্তু তাদের জন্যে ভারি চিন্তা করতেন। আহা, ভাল ছিল ভুতগুলো! কোথায় যে যাবে, কে যে ওদের সঙ্গে মানিয়েগুছিয়ে চলবে।

ওঁর ছেলেদের বলেছিলেন, নায়েব হ গিয়ে।

ছেলেরা কেউ রাজী হয়নি। বাপ রে! ভূতে ভূতে ছয়লাপ গ্রামে নয়েবী করা কি সোজা কথা?

এই হল ভুতদের কলোনি ভুতানন্দের সত্যি গল্প।

বুনো কাণ্ড

এ আজকের গল্প নয়, ১৭৪২।৪৩ সালের গল্প। তবে গল্পটি পড়লেই বুঝবে, এ গল্প কখনো পুরনো হতে পারে না। এ গল্প সব সময়েই নতুন থাকে।

তখন বর্গীর হাঙ্গামা বলতে যা বোঝ, তা-ই চলছে। এই বর্গীর হাঙ্গামা জিনিসটি কিন্তু সহজ নয়। এমনকি ছেলে-ভোলানো ছড়া 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে'র মধ্যেও এক ভয়ংকর সর্বনাশের ইতিহাস লেখা আছে। বর্গী বা বার্গীর বলা হত মারাঠা সরকারের অশ্বারোহী সেনাদের। যখন বর্গী আসে, তখনো বাংলা সুবা বা রাজ্য আইনমতে ছিল দিল্লীর বাদশার অধীনে। তবে দিল্লীর বাদশাহকে পাত্তা না দিয়ে আলিবর্দি খাঁ বাংলা সুবা স্বাধীন নবাবের মতোই শাসন করতেন। 'নবাব' খেতাবও পেয়েছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ্ বাংলার রাজস্ব পেয়েই খুশী। রাজ্যশাসন করার ক্ষমতা বা ইচ্ছে কোনটাই তাঁর ছিল না। কে মাথা ঘামিয়ে রাজ্য শাসন করে? তার চেয়ে খাসা পোলাও আর শাহী কোর্মা খেয়ে ঘুড়ি উড়িয়ে বা দাবা খেলে দিন কাটানো অনেক ভালো। অনেক ভালো পায়রা পোষা, মোরগ লড়াই করানো, ঘোড়ার পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচানো।

বুঝতেই পারছ বাদশাহটি কত কাজের মানুষ ছিলেন। ইনিই শিবাজীর বংশধর রঘুজী ভোঁসলেকে অনুমতি দেন, "তোমরা বাংলায় গিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে নিজেরা রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ বা চৌথ আদায় কর।" আলিবর্দিকে এ কথাটা জানালেন না বাদশাহ। অথচ তিনি ভালো করেই জানতেন, রঘুজী ভোঁসলের সৈন্যসামন্ত ভীষণ নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী। এও তিনি জানতেন যে, এরা হানা দিলে বাংলায় সর্বনাশ নামবে এবং তিনি নিজেও বাংলা থেকে এক পয়সা

পাবেন না। সবচেয়ে মজার কথা হল, দিল্লীর রাজকোষ তখন চনচনে। বাংলা থেকে রাজস্ব যায় বলে দিল্লীতে বসে বসে বাদশাহ্ বাদশাহী ঠাট-ঠমক চালাতে পারেন।

যা হোক, রঘুজী ভোঁসলের সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত তো হাজার হাজার বর্গী নিয়ে এসে হানা দিল বাংলায়। চাষী যদি চাষ করে, তাহলেই দেশের রাজস্বের প্রধান অংশটা মেলে। বর্গীরা এসে মেরে ধরে লুঠতরাজ করে, গ্রামে জ্বালিয়ে সব ছারখার করে দিল। আলিবর্দি যতদিন নবাব ছিলেন, সেই ষোল বছরের মধ্যে এগারো বছর ধরেই বর্গীরা বারবার আসত। উড়িষ্যা থেকে মেদিনীপুর দিয়ে যাওয়া আসার পথ ছিল তাদের। আলিবর্দি যুদ্ধ করে-করে নাজেহাল। তাঁর সৈন্যদের মধ্যে ছিল আমাদেরই গ্রামীণ মানুষ যত।

'আগ ডুম বাগ ডুম' ছড়াতেও গ্রামীণ মানুষের লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে ডোম সৈন্যদের কথা। ছড়াটি মুখে মুখে অন্যরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মূলে ছড়াটিতে কী বলা হয়েছিল জানো? আগে ডোমরা চলেছে, পিছনে ডোমরা চলেছে, ঘোড়ায় চড়েও ডোমরা চলেছে। অর্থাৎ পায়ে হাঁটা সেপাই, ঘোড়ায় সওয়ার সেনা—সবাই ডোম। এ ডোমদের ফৌজ। বাজছে ঢাক, কাঠের মৃদঙ্গ ও ঘাঘর বা ঝাঁঝ। অর্থাৎ যা হোক, বর্গীদের অত্যাচার চলতে থাকল। ওরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামবে না কিছুতেই। তাই আজকের পশ্চিমবঙ্গের ওপরেই চলল হানা। কেন না বর্ষা ছাড়া অন্য সময়ে পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলি ওরা পেরোতে পারত। তা বলে কি গঙ্গা বা রূপনারায়ণ পেরোত? তা নয়। অজয়, কোপাই, ময়ুরাক্ষী, দারকেশ্বর, ব্রাহ্মণী, সুবর্ণরেখা, দামোদর, কাঁসাই শীতকালে বা গরম কালে সহজেই পেরোত ওরা।

গ্রামের মানুষ পালাতে থাকল ঘর-দোর ছেড়ে। জঙ্গলের শেষ নেই জঙ্গলে লুকিয়ে থাকত। পরিত্যক্ত গ্রামগুলিতে জঙ্গল গজাল। বড় দুর্দিন, বড় দুর্দিন।

মেদিনীপুর উড়িষ্যা সীমান্তে, সুবর্ণরেখার তীরে জোড়কদম গাছ। দুটি কদমগাছ গায়ে গায়ে উঠেছে, দেখতে বড় সুন্দর। এক জোড়া কদমগাছের জন্যেই গ্রামের নাম জোড়কদম।

এই গ্রামেরই দুই দুঃসাহসী তরুণ বুনো আর কালী। দুজনেই ডোমের ছেলে। মুর্শিদাবাদের বাড়ি। ছোটবেলা থেকে বড্ড শখ, যুদ্ধে যাব, সেপাই হব। তা ঢাল আর বর্শা নিয়ে দুজনে নবাবের ফৌজে ঢুকেও পড়ে।

সেই ফৌজের সঙ্গে ওরা উড়িষ্যার সীমান্ত পর্যন্ত আসে। তারপর মারামারি-কাটাকাটির সময়ে লড়তে লড়তে কীভাবে যেন দল থেকে চার-পাঁচজন ছিটকে পড়ে। ওরা মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়ছে, বর্গীরা ঘোড়ার ওপর চেপে। সংখ্যায় বর্গীরা বিশ-ত্রিশ জন হবে। বর্গীরা যথেচ্ছ তরোয়াল চালিয়ে ওদের মেরে চলে যায়। বুনো আর কালী গড়িয়ে পড়ে সুবর্ণরেখার চরে। বর্ষা কেটে গেছে। চরে বড় বড় ঘাসের ঢেউ খেলছে বাতাসে। ওপাশে সমুদ্রের নীল জল দূরে গর্জাচ্ছে, এপাশে সুবর্ণরেখার স্রোত। মাঝে এই চর। বুনো আর কালী অজ্ঞান হয়ে যায়।

জ্ঞান হয়েছিল যখন, চোখ মেলে ওরা দেখেছিল তারা-জ্বলা আকাশ। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠেছিল ওরা, আর কারা যেন বলেছিল, বেঁচে আছে!

তারপর নীচু গলায় বলেছিল, কারা, কারা বেঁচে আছ সাড়া দাও গো! আমরা তোমাদের তুলে নিয়ে যাব।

বুনো বলেছিল, সবাই সাড়া দিতে পারে?

—কে? কে তুমি?

মশাল জ্বেলে কয়েকটি তরুণ ছেলে এগিয়ে এসেছিল। বুনো আর কালীকে ধরাধরি করে বয়ে নিয়েছিল ওদের ডেরায়। জঙ্গলের মধ্যে গাছের ঘেরাদেওয়া লম্বা ঘর।

কোথায় আনলে? —বুনো শুধিয়েছিল।

—চুপ, চুপ!

ছেলেগুলি ওদের ক্ষত ধুয়ে মলম দিয়ে বেঁধে দেয়, খেতে দেয় জাউ ভাত। সকালে বুনো আর কালী বলেছিল, কোথায় আনলে? তোমরা কে?

ছেলেরা বলেছিল, আমরা জোড়কদম গ্রামের ছেলে। জঙ্গলে থাকি এখন।

—কেন?

একটি বছর দশেকের মেয়ে, ডুরে শাড়ি গোছ কোমর বেঁধে পরা, সামনে এসে বলেছিল, কেন? শখ করে। ঘর ছেড়ে জঙ্গলে থাকতে ভালো লাগে যে।

যাঃ। তা কি হয়?

কেন হবে না? তোমরা যে কচুকাটা হচ্ছিলে, সেও তো শখ করে। তাই না?

কালী বলেছিল, বর্গীরা গ্রামের সব জ্বালিয়ে দিয়েছে বুঝি?

মেয়েটি নথ নেড়ে বলেছিল, তারা হল কাজের লোক। গ্রাম জ্বালিয়েছে আর মানুষগুলোকেও কচুকাটা করে আগুনে ফেলেছে। আমরা কজন পালিয়েছিলাম। প্রাণে বেঁচেছি। শুনলে তো সব? এখন ঘুমোও।

সকালে ঘুমোব কি?

না ঘুমোলে ঘর পাহারা দাও। আমরা বেরোই। ঘরের ছাই খুঁজে খুঁজে চাল আনতে হবে তো। ওষুধও আনব। সব শেষ করে গেল বর্গীরা, বাবার ওষুধ-মলমের পেঁটরাগুলো কিন্তু যেমন ছিল তেমনি আছে। আশ্চর্য।

তোমার বাবা কবিরাজ?

হ্যাঁ গো! এই রতন, গোবিন্দ আর দুর্যোধনের বাপরা ছিল চাষী। এই জগাটার বাবা আমাদের নাপিতকাকা।

তোমার বিয়ে হয় নি?

উঁহুঁ। বাবাকে পুরুতকাকা বলেছিল, "ষোল বছর না হ
রাধির বিয়ে দিও না! বর মরে যাবে।" যাই বাপু, এখন আবা
তারা এসে পড়বে।

কারা?

কেন, তোমাদের মতো সেপাইরা। আরো তো সাতজন আছে
আমরাই এনেছি খুঁজে খুঁজে।

কোথায় গেছে?

হাতিয়ার কুড়িয়ে আনবে। এনে এনে ওরা সব জমা করছে দে
না। বর্গীরা চলে গেলে ওদের লুঠেরারা আসে হাতিয়ার কুড়োতে
কত ঢাল, বর্শা, ছোরা- দেখছ? বর্গীদের হাতে তুলে দেব কেন?

রাধিদিদি! তোমার মতো মেয়ে তো আমরা দেখি নি।

দেখবে কোত্থেকে? মা বলত 'দস্যি, গোছা! বলত, "যম তো
নেবে না।"

রাধি খরখর করে চলে গেল। রতন বলতে বলতে গেল, আ
নির্ঘাত আবার লড়াই হবে।

এর সময় সেই সাতজনও ফিরল। অনেক হাতিয়ার কুড়িয়ে এনে
ওরা। বুনো আর কালীকে দেখে জেমো গ্রামের মাতঙ্গ বলল কতক্ষণ

কাল রাতে।

একটুও অবাক হল না ওরা! বলল, রাধি দিদি কোথায়
আবার গেছে গ্রামে?

তা-ই তো বলল।

মাতঙ্গ বলল, উদ্ধব, একবারটি যেয়ে দেখ তো ভাই। জাল পে
এসেছিলে হরিণ টরিণ পড়ল নাকি!

বুনো আর কালীকে রাধিদের কথা বলল মাতঙ্গ। ছোট হলে
জমজমাট গ্রাম ছিল ওই জোড়কদম। যখন বর্গীর লড়াই শুরু হ
চাকলাদার ভূষণ মাহিতি এক ফৌজ নিয়ে চলে যায় লড়তে।
ফৌজে জোড়কদমের যুবকরা চলে যায়, প্রৌঢ়রাও অনেক।

ফৌজের এখনো দেখা নেই। জোড়কদমের যারা ওই যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফিরবে, তারাই ভরসা।

বর্গী এসে পড়লে কী হয়, জোড়কদমের লোকেরা তা বোধহয় আগে বোঝে নি। জোড়কদম থেকে তিন ক্রোশ তফাতে নবাবের ফৌজের হাতে বর্গীরা বেদম হেরে যায়। সেই রাগেই ওরা গ্রাম লুঠ করে জ্বালাতে জ্বালাতে আসছিল। জোড়কদমের মতো অনেক গ্রামই সে যাত্রায় শ্মশান হয়। জোড়কদমও গেল। রাধি আর এই ছেলেরা জঙ্গলে পালিয়ে বেঁচেছিল।

কত দিন আগে?

তা মাস ঘুরে গেল।

তাতেই গ্রামে জঙ্গল হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। তখনো বর্ষা চলছে। শেষ বর্ষার জল পেয়ে বুনো আগাছা, ঝোপ হয়েছে।

এ ঘর কারা করেছে?

আমরা করি নি। চাকলাদার ভূষণ রায় বনে শিকার করতে এলে এখানে বিশ্রাম করত। রাধিদিদিরা ঝেড়েঝুড়ে নিয়েছে। ওরাই তো আমাদের টেনে এনে বাঁচাল। নইলে বর্গীর বেটারা যে কোপ মেরেছিল, বাঁচতাম? ওরা গিয়েছিল গ্রামের লোকদের খুঁজতে।

আমাদেরও তো বয়ে আনল!

মাতঙ্গ হাসল। বলল, তখন তোমাদের তেমন হুঁশ ছিল না। চর থেকে ওরা টেনে আনল, বয়ে এনেছি আমরা। এখন ওদের যমন দেখছ, তেমন মনের জোর ছিল না। আমরা এসে পড়লাম, তারপর মনের জোর ফিরল।

কবে ওদের আপনজনরা ফিরবে?

কে জানে!

স-ব এই বর্গীর জন্যে।

মাতঙ্গ হাই তুলে বলল, তা ওদের ভাস্কর পণ্ডিত আর আমাদের

নবাব আলিবর্দি দুই বাঘ-সিংহ লড়াই করুক না যত খুশি। আমাদের জীবনটা যে গেল!

ভজন বাগদী বিরস মুখে বলল, জীবন গেলে ভালো ছিল। ডান হাতটা কাটা গেল, এ কী হল বল, তো?

মাতঙ্গ বলল, তা বাঁ হাতে তো বর্শা-সড়কি মন্দ চালাচ্ছ না বুঝলে হে ভজন দারুণ পাকা বর্শেল।

এসব কথাবার্তা চলতে চলতেই রাধিরা ফিরে এল শুকনো মুখে বলল, চাল বল, ক্ষুদ বল, কিছু নেই গো।

তবে আজ হরিণের মাংস! —মাতঙ্গ বলল।

রাধি বলল, আমরা না খেয়ে থাকি, আর উৎসব মহান্তির ভালে চাল, ডাল, সব খাক ওই বর্গীরা।

উৎসব মহান্তি? —বুনো অবাক হয়ে শুধোয়।

সে এখানকার এক ভূঞা। বর্গী-ছাউনিতে ভারে ভারে সিধে পাঠিয়ে ও নিজের এলাকা ঠাণ্ডা রেখেছে।

বুনো আর কালী এ ওর দিকে চাইল। দুজনেই নানা বজ্জাতি করেছে গ্রামে থাকতে।

হুমহাম করে মস্ত হরিণ নিয়ে উদ্ধবরাও এসে পড়ল। হরিণ রাঁধার চমৎকার বুনো নিয়ম ওরা বের করেছে। কোথায় মসলা, কোথায় কী! মাংস ফালা ফালা করে কাট, ধুয়ে নিয়ে নুন-লঙ্কা মাখ, মোটা বাঁশের চোঙে ভর, চোঙের মুখ আটকাও। চোঙগুলোয় মোটা করে কাদামাটির আস্তর লাগাও। তারপর গনগনে কাঠ কয়লার আগুনের পাঁজায় পুরে রাখ চোঙগুলো। জোড়কদম গিয়ে পুকুরে স্নান করে এস। ঘণ্টা তিনেক বাদে ধোঁয়া-ওঠা সুসিদ্ধ মাংস খাও।

খাওয়াদাওয়ার পরে বুনো মাতঙ্গকে বলল, সিধে যাবে কবে? সেসব জান? কালই যাবে। হপ্তাখানেক হয়েছে তো।

ভালো। এই বর্গীসর্দার ভাস্কর পণ্ডিত কালীপুজো দুর্গাপুজো করে খুব তা জানো? না ভুলে গিছলে?

ভুলব কেন? জেনেই বা কি লেজ গজাবে?

আহাহা, দুর্গাপুজো নয় আশ্বিনে হয়। কালীপুজো তো সারা বছর করা চলে।

তাতে কী?

বুনো আছে, কালীও আছে। বুনো কালীর পুজো না দিয়ে ওরা যাবে কী করে সিধে নিয়ে?

বুনো কালী? মাতঙ্গর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। তারপর ও হাসতে শুরু করল। বলল, তবে তো বুনোকালীর পুজো দিতেই হয়।

ওরা কোন পথে যায়?

এ পথেই!

পরদিন উৎসব মহান্তির পেয়াদারা সামনে-পেছনে দৌড়চ্ছে, ভারীরা বাঁকে ঝুড়ি-ঝুড়ি চাল ডাল মসলা-ঘি-তেল বইছে। পেয়াদা-দের হাতে সড়কি। ওদের মেজাজ খুব খারাপ। ওদের কথাবার্তায় তা চাপা থাকে না।

আর এ সিধে বইতে পারি না।

এতদিন বেটারা ছোলারা ছাতু খেত আর হানা দিত। এখন চাই তোফা চাল ডালো ঘি।

আরে মহান্তির আর কী! হুকুম হল, নিয়ে যা। নিতে তো হয় গাঁ থেকে। গাঁয়ের লোক ক্ষেপে যাচ্ছে না?

যতনকে তো চেনো না। সে বলছে, 'আজ চাল, কাল ডাল, পাইক-পেয়াদাগুলোকে সড়কিতে ফুটো করে পালাব এবার।'

অ্যাঁ? তা-ই বলেছে?

এইসব কথার মধ্যেই ওরা বনের পথে এসে পড়ল। পেয়াদারা বলল, ওঃ জোড়কদম গ্রামের দিকে চাইলে ভয় করে। সবাই বর্গীর হাতে মরল, সবাই ভূত হয়ে আছে।

'রাম রাম! বলতে বলতে ওরা যাচ্ছে। হঠাৎ মানুষ নেই, জন নেই, বন কাঁপিয়ে কারা যেন প্রেতের গলায় বিকটভাবে চেঁচিয়ে উঠল

—নামা সিধা ! বেরো বন থেকে। বুনো কালীর পূজো না দিয়ে বন দিয়ে চলা ! কৈলাস থেকে আমাদের নেমে আসতে হল !

তারপরই শোনা গেল অট্টহাসি।

পাইক-পেয়াদা, ভারী, সবাই প্রথমে থমকে গেল। তারপর বাঁক নামিয়ে 'বাবা গো !' বলে ছুট।

মুখ থেকে মাটির হাঁড়ি নামিয়ে মাতঙ্গ বলল, ওঃ, হাঁড়িতে মুখ রেখে চেঁচালে এমন শব্দ হয় ?

বুনো বলল হয়। আমি আর কালী জানি। ভয় দেখিয়ে গয়লাদের ভাগিয়ে দিয়ে কম দই খেয়েছি ?

ওঃ, কত চাল !

ওরা বাঁক তুলে নিয়ে বনে ঢুকে গেল। আর পাইকরা ফিরে গেল মহাস্তির কাছে। না, আর তারা যাবে না সিধে নিয়ে। খলখল হাসি, বিকট চীৎকার, বুনো কালীর পূজো না দিলে ও পথে যাওয়া যাবে না।

বুনো কালী ? নাম তো শুনি নি ! —মহাস্তি অবাক।

পাইক সর্দার বলল, সে বললে হবে কেন ? চারদিকে কাটা পড়ে মরছে। প্রেত হয়ে আছে সব। প্রেত-পিশাচ নিয়ে কারবার সে দেবতার। তাতেই বনে এসে বুনো কালী হয়েছে।

বর্গী সর্দার রাম রাও তা শুনবে ?

আমরা পারব না।

অগত্যা অনেক বখসিস কবুল করে উৎসব মহাস্তি নিজে চারজন বরকন্দাজ আর চারজন ভারী নিয়ে রওনা হল। রওনা হতে হতে বিকেল হল। তা হোক। উৎসব নিজেও যুদ্ধ করেছে। সে সাহসী লোক। সিধে না গেলে রাম রাও তার গ্রামকে শ্মশান করে ছাড়বে, জানা কথা।

বনের পথে পা দিতে ওদের কথাবার্তা ক্রমে কমে এল। উৎসব চারদিকে চাইতে চাইতে চলল। ওর মনে অনেক প্রশ্ন। বর্গীরা

মেরে-কেটে যাবার পরও শবদেহগুলি দাহ করতে গেছে লুকিয়ে। সুবর্ণরেখার বালির ওপর মানুষ টেনে নেবার দাগ দেখেছিল। জোড়কদমে সবাই কি নিঃশেষে মরেছিল? বনে কি কেউ কেউ লুকিয়ে আছে? থাকলে থাকুক। উৎসব তাদের ধরাতে যাবে না। বর্গীদের জুলুম-এড়াতে চায় বলেই সিধে পাঠাচ্ছে। নইলে কে চায় এমন অত্যাচারীকে সাহায্য করতে?

গহীন বন। গাছপালায় ঝুপসি। বটের ঝুরি কতদূর ছড়ানো! হঠাৎ, কচি মেয়ের গলা অদৃশ্য থেকে অমানুষী তীব্রতায় শোনা গেল—আমার পূজো না দিয়ে বনের পথে কে যায়? কার এত বড় আস্পর্ধা?

উৎসব ভক্ত মানুষ। সন্ধ্যা হয়-হয়, নির্জন বনে মেয়ের গলা ভেসে এল যখন, তখন তার মনে ঠাকুরদেবতা সম্পর্কে চিরকালের ভয়-ভক্তি মিলে-মিশে ছুটে এল, ভাসিয়ে নিল তাকে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ে। তারপর লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করল। ভারীদের বলল, নামা তাদের বাঁক! চলে যা সবাই।

ওপরের দিকে চেয়ে বলল, পূজো দেব মা!

তারপর হেঁটে রাম রাওয়ের ছাউনিতে গেল সে। রাম রাও প্রথমে তাকে কাটতে উঠেছিল. তারপর তার মনেও সংশয় দেখা দিল। যদি সত্যি হয়? যদি সত্যি হয়? তার সহকারী তানাজী বলল, ভাস্কর পণ্ডিত খুঁজে খুঁজে পূজো দিচ্ছে। তুমি এমন এক জাগ্রত দেবীর খোঁজ পেয়ে একে মারতে যাচ্ছ?

মারাঠারা এ ওকে 'তুমি' বলে।

রাম রাও বলল বেশ। চল, আমিও যাব।

এল, ওরা সবাই এল। তখন রাত। তারা ফুটেছে আকাশে। বটগাছটির কাছে আসতেই শোনা গেল সেই আশ্চর্য মেয়ের গমগমে গলা—ও কে? ওকে কেন এনেছিস?

রাম রাও সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ল। তানাজীও। রাম রাও ভয়ে-ভক্তিতে বলল মা! দয়া কর মা!

পূজো দে! পূজো দে! পূজো দে!

দেব মা গো! তুমিই শিবাজী মহারাজের ভবানী, তুমিই দুর্গা, তুমিই কালী।

অমাবস্যায়! অমাবস্যায়! তাই হবে মা!

একা! একা! একা!

তা-ই হবে!

এমন অভিভূত হয়ে গেল রাম রাও যে, কয়েকদিন ধরে গ্রাম জ্বালাতে মানুষ মারতে ভুলেই গেল। পুজোর জোগাড় করতে ব্যস্ত রইল বেজায়। লুটের সোনা দিয়ে জবাফুল গড়াল। উড়িষ্যা পাঠিয়ে পাঠিয়ে স্যাকরা ধরে আনল। তারপর অমাবস্যার বিকেলে রওনা হল পুজো নিয়ে। একা। সে তো রাম রাও, বর্গী সর্দার। কাউকে ভয় পায় না। ভয় পায় না বলেই স্বয়ং বুনো কালী তার ওপর কৃপা করেছেন। বুনো কালীর নাম লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

সেই যে গেল রাম রাও, আর সে ফেরেনি। কী যে হল তার, কিছু জানা গেল না। ঘন বন, সবুজ বন, হিংস্র বন একেবারে যেন তাকে গ্রাস করে নিল।

সর্দারকে বুনো কালীই নিয়েছেন, এরকম কথাও শোনা যেতে থাকল। আলিবর্দির ফৌজ এসে পড়ছে, এখন সর্দার নেই, বিশৃঙ্খল অবস্থা। তানাজী রাতারাতি ছাউনি ফেলে ফৌজ নিয়ে উড়িষ্যার দিকে পালাল।

বুনো কালীর মাহাত্ম্য অসম্ভব রটে গেল। উৎসব মহাস্তি ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পুজো দিয়ে গেল বটগাছের গোড়ায়। কালীকে কাঁচা চাল দিতে হয়। অনেক চাল।

রাধি বলল, মাটির হাঁড়ি নিয়ে অত চেঁচিয়েছিলাম বলেই না এ সব পেলে, বুঝেছ? মাতঙ্গ বলল, কিছুদিনের মতো নিশ্চিন্দি।

বুনো আর কালী বলল, সেসব পরে হবে। ভালো করে ভাত রাঁধ। আমাদের খাওয়াও। আমরা হলাম গে, যাকে বলে জাগ্রত দেবতা বুঝেছ?

রাধি বলল, বুঝেছি গো, বুঝেছি! ওদিকে যুদ্ধ চলতে থাকল।

ঝারোয়ার জঙ্গলে

মাইনু, সোনাম আর তাতা এখনো জানে না ওদের সেই ঝারোয়া জঙ্গলের অভিজ্ঞতাটা সত্যি, না মিথ্যে না স্বপ্ন। অথচ এ কথাও সত্যি যে ওরা চারজন ঢুকেছিল জঙ্গলে। বাদল আর কোনদিন ফেরেনি।

বাদলের জেদেই ঝারোয়া যায় ওরা। নইলে ঝারোয়ার নাম ওরা শোনেইনি কোনোদিন। বাদলের কাকা পালামৌয়ের এক জঙ্গলে কাঠ কাটবার ঠিকাদার। এ বছর মার্চ মাসে বাদল ওঁর সঙ্গে কাজে লাগবে। স্কুল থেকেই চারজন বেজায় বন্ধু। মইনু আর তাতা সবে ব্যাঙ্কে ঢুকেছে। সোনাম ওর বাবার খবরের কাগজের আপিসে ঢুকবে এবার।

বাদলই বরাবর বেজায় ছটফটে আর খেয়ালী। স্বাস্থ্যটা ওর রীতিমত ভালো। দেখলে বাঙালী ছেলে মনে হয় না। বাদলের উৎসাহে ওরা সাইকেলে ভারতবর্ষ ঘুরেছে। হিমালয়ে উঠেছে কয়েকবার।

বাদলের একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। কি সে ক্ষমতা, কয়েকটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবে।

"তরুণ দল" ক্লাবের সঙ্গে সেবার ওরা গঙ্গোত্রীর কাছে এক গ্লেসিয়ারের গতিপথ দেখতে গিয়েছিল। যেখানে বেস্‌ক্যাম্প করার কথা, বাদল বলল, এখানে নয়। এখানে ভীষণ দুর্ঘটনা হবে।

দলের নেতা মোহনবাবু চটে গেলেন। তিনি একজন পাকা পর্বতারোহী। সঙ্গে আছে তিনজন অভিজ্ঞ শেরপা। তাঁরা বুঝছেন না, বাদল বেশি বুঝছে?

বাদল বলতে গেলে তাঁকে অমান্য করেই বন্ধুদের নিয়ে ফিরে গেল তাঁবুতে। আর সেই রাতে চাঁদের আলোয় যখন ধুয়ে দিচ্ছে বরফের

আঙিনা, অপ্রত্যাশিত বরফের ধস্ নেমে মোহনবাবুদের বেস্‌ক্যাম্প নিশ্চিহ্ন করে দিল।

ঠিক এমনি ঘটে আগ্রায় তাজমহল দেখতে গিয়ে। হঠাৎ বাদল বলল, এক্ষুনি চল্ এখান থেকে। কিছু একটা ঘটবে। থাকলে জড়িয়ে পড়ব।

ওদের খুব কাছে বসে নিথর হয়ে তাজমহল দেখছিল একটি যুবক। তার মত নিবিষ্ট হয়ে তাজমহল সেদিন আর কেউ দেখেনি।

ওরা তো চলে এল। তার আধঘণ্টা বাদেই না কি দুজন লোক এসে যুবকটিকে লক্ষ্য করে দুমদাম গুলি ছোঁড়ে। যুবকটিও প্রস্তুত ছিল। দু পক্ষের সে লড়াইয়ে যুবকটি মরল। ভ্রমণার্থী জখম হল।

বাদল আগে থেকে অশুভ কিছুর আঁচ পেত। মইনু, সোনাম আর তাতা তো তা স্বচক্ষে দেখেছে। ঝারোয়াতে গিয়ে কি হল?

সব যেন দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়।

মার্চে কাজে লাগবে বাদল। খুব উত্তেজিত। জঙ্গলে ঘুরবে, কত রকম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হবে। বাদলই বলল, তোরাও চল্। কয়েকদিন থেকে চলে আয়। শিকার করা যাবে?

যাঃ, শিকার করা বারণ। পাখি টাখি মারতে পারবি।

আর এক আধটা হরিণ—

থাকব কোথায়?

কাকার বাংলোতে। কাকা বিয়ে করল না ঃ সারা জীবন কাটাল জঙ্গলে জঙ্গলে। এক সময়ে বর্মায় হাতি ধরত। চল্ না, গল্প করবে জমিয়ে।

বাদলের কাকা থাকার জন্যে জায়গা বেছেছেন বটে। ট্রেন থেকে নামো কোমাণ্ডি নামে একটা জঙ্গল ঢাকা স্টেশনে। তারপর কাকার জীপে চল্লিশ মাইল ভিতরে চলো। সুমা নামের একটা জায়গা। সুমা নদী পাথরে পাথরে নেচে বয়ে গেছে এঁকেবেঁকে। কাকার বাংলার চারদিকে উঁচু কাঁটাতারের বেড়া।

এক সময়ে এখানে বক্সাইটের খনির কাজ শুরু হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর কাজও হয়। তারপর খনির কাজের জন্য তৈরি রাস্তা-গুলো এখনো আছে। সেই পথেই কাঠবাহী ট্রাক চলে যায় ডালটনগঞ্জ।

দেখা গেল কাকা সংক্ষেপে জবাব দেন।

কাঁটা তারের বেড়া দিয়েছ কাকা?

হাতি আসে।

বেড়া উপড়ে ফেলতে পারে না?

পারে, ফেলে না। প্রখর বুদ্ধি রাখে।

মার্চ মাসেই বিকেল নাগাদ বেশ ঠাণ্ডা, সন্ধে থেকে শীত শীত।

বন তিতিরের রোস্ট আর চাপাটি খাওয়া হল। কফি খেয়ে কাকার মেজাজ যেন একটু খুশি হল।

তোরা তো এলি, কিন্তু সময়টা ভাল যাচ্ছে না। ভালো জঙ্গলটাতেই কাজকর্ম বন্ধ, কি যে হবে।

কেন? কাজকর্ম বন্ধ কেন?

কি যে বলি, নিজেই বুঝছি না।

বল না, বল না।

ওই পাহাড়টার ওপারে ঝারোয়ার জঙ্গল। কখনো হাত পড়ে নি, ভালো ভালো শালগাছ অঢেল।

কাকা কাহিনীটা বললেন। জঙ্গলটা জমা নেয় এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। নেয় খুব অদ্ভুত কারণে। নির্জনে থাকবে বলে নেয়।

একটা বাড়ী বানায়। বউ নিয়ে আসে। জানা যায় ওদের একটি বাচ্চাও জন্মায়। সপ্তাহে সপ্তাহে ধীলন হাটে আসত সওদা করতে।

হঠাৎ পর পর কয়েক সপ্তাহ তার দেখা নেই।

অবশেষে এক অবিশ্বাস্য খবর আসে কাকার কাছে। ধীলনের জীপ গাড়িটা রাস্তায় পড়ে আছে। আর ধীলনের মৃতদেহ পড়ে আছে তার বাড়িতে। বউ আর বাচ্চা উধাও।

কাকা তো গেলেন। তিনি দেখলেন ধীলন তার বারান্দায় পড়ে আছে। তার মুখে চোখে অবিশ্বাস্য আতঙ্কের ছাপ। ঘরের মধ্যে পড়ে আছে বিশাল গ্রেটডেন কুকুরটা। ধীলন বা কুকুর, দুটো মৃতদেহেই এক ফোঁটাও রক্ত নেই। ধীলন কাগজের মত সাদা।

বউ বা বাচ্চার কোন খোঁজ নেই।

খোলামেলা বাড়িতে মৃতদেহ পড়ে আছে। হায়েনা বা শিয়াল টানাটানি করেনি। কাকার জঙ্গলকুলিরা বলল, এ কোনে পিশাচ-দানোর কাণ্ড।

আর তাদের কাছেই কাকা জানতে পারলেন। ধীলন বিয়ে করেছিল একটি মেয়েকে, যার কোনো কুলুজিকুষ্ঠি সে জানত না। জঙ্গলের মধ্যে একা একা মেয়েটিকে ঘুরতে দেখে সে নিয়ে আসে ও বিয়ে করে। গজাড় জঙ্গলে একা একা কি কোনো মানুষের মেয়ে ঘোরে?

কাকা সে কথায় কান দেননি একেবারে। জঙ্গলে কাজ করতে হলে অত ভিতু হলে চলে না। আর এ কথা তিনি জানেন যে কুলিদের বেজায় বিশ্বাস ভুতপ্রেত, দেওপিশাচে। তিনি ধীলনকে দাহ করান, কুকুরটিকে কবর দেওয়ান। বাড়িটা বন্ধ করে চলে আসেন জীপটি নিয়ে।

তারপর জঙ্গল আপিসের সহায়তায় ধীলেনের কে আছে, না আছে খোঁজ নেন। অবশেষে রাঁচি থেকে এল ভার্মা নামে একটি ছেলে। ধীলন তার মামা।

ভার্মা বলল, আমি ওখানে বাস করব না। বাড়িতে যা আছে তা জীপে চাপিয়ে নিয়ে রাঁচি চলে যাব।

ভার্মার সঙ্গে তার এক বন্ধুও এসেছিল। কোনো জঙ্গলকুলি ওদের সঙ্গে গেল না। তার সাফ বলে দিল। জানোয়ারের ভয় করি না। যেখানে জানোয়ার অব্দি ঢোকে না, সেখানে কে যাবে?

কাকা তাঁর হেড কুলিকে ধমকালেন। হেড কুলির নাম দাসাইন ওরাওঁ। সে বলল, বাবু! আমরা তো যাবই না। ওই বাবুও যেন না যায়।

ভার্মা সে সব কথা উড়িয়ে দিল। ভার্মার কাছেই কাকা ওই জঙ্গলটা ইজারা নিলেন। আদিম অরণ্য, বড় বড় শাল গাছ, প্রত্যেকটা গাছ খুব দামে বিকোবে। ভার্মা যাবার দিন হাটেও দেখা হল। ভার্মা বলল, কাল সকালে একবার আসবেন। একটু চা বানিয়ে আনলে তো কথাই নেই।

সেই শেষ দেখা। পরদিন সকালে থার্মস্ ভর্তি চা নিয়ে ঝারোয়ার জঙ্গলে হাজির হয়ে কাকা দেখেন ভার্মা এবং তার বন্ধু ঘরের মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছে। দুজনেই মৃত, দুজনের চোখ অবিশ্বাস্য আতঙ্কে বিস্ফারিত দুজনের শরীরই রক্তশূন্য।

ছেলেরা বলল, তারপর?

দুজনের গলাতেই ছোট ছোট পাংচারের দাগ ছিল।

তার মানে কি?

জানি না। পুলিস এখনো খোঁজ চালাচ্ছে। কিন্তু কোনো কিনারা হয়নি। শুধু ভয়ঙ্কর আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। কেউ যাচ্ছে না ওখানে গাছ কাটতে।

পুলিস যাচ্ছে না? কয়েকবার গেছে। সেও এক রহস্য।

কি রকম?

বাড়িটা পুলিস বন্ধ করে তালা মেরে আসছে। পরে গিয়ে বাড়ি খোলা পাচ্ছে। সব ঝকঝকে তকতকে। কে বলবে যে বাড়িতে মানুষ থাকে না। তার মানে কি?

কোনো মানুষ আছে এর পেছনে। আমার তাই বিশ্বাস। হাজার সত্তর শাল গাছ, করম গাছ, লাখ লাখ টাকার জঙ্গল তো। কেউ আতঙ্ক সৃজন করছে।

কাকা খুব মুশড়ে পড়েছেন মনে হল। ঝারোয়ার জঙ্গলের ওপর খুব ভরসা করেছিলেন। বাদল বলল, তুমি ভাবছ কেন? আমরা চারজন আছি, বন্দুক নিয়ে থেকে যাব ওখানে। সব রহস্য ফরসা হয়ে যাবে।

পরদিন দাসাইন ওরাওঁ ওদের নিয়ে গেল চিপা ফরেস্ট। সেখানে

এখন গাছ কাটা চলছে। দাসাইন খুব আত্মসম্মানী ভারভারিক্কি লোক। গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরে ও, হাতে রাখে ছড়ি। দাসাইন বলল, তোরা যাস না ঝারোয়া।

কেন? সেখানে কি আছে?

বোস্, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই, চায় লা।

ওভারসিয়ারের তাঁবুর কাছে একটা লোক কেটলিতে চা বানাচ্ছে, বিড়ি বেচছে। কাটা গাছের উপর বসল ওরা। দাসাইন বলল, বাবু অনেকদূর বুঝে। সবটা বুঝে না।

দাসাইনের গল্পটা জঙ্গলে বসে মনে হয়েছিল গল্প, আর শহরে বসে মইনু, তাতা ও সোনামের আজ মনে হয় সত্যি। কেন এমন হয়?

গল্পটা এই রকম আদি অন্ত কাল আগে যখন পৃথিবী তৈরি হচ্ছিল, তখন বড় দেবতার সঙ্গে অসুরদের বউরা যুদ্ধ করতে যায়। বড় দেবতা শূন্য থেকে বউগুলোকে নিচে ফেলে দেন। তারাই হয়ে গেল পাহাড়। পাহাড়ের কোল দিয়ে ক্রমে বনও গজাল। আর একথাও সত্যি যে নানারকম মানুষ এসে সব জঙ্গল, সব মাটির দখল নিয়েছে।

তবু বনের কোনো কোনো জায়গা থাকে সংরক্ষিত। মানুষ সব দখল করছে বলে পাহাড় জঙ্গলের আত্মারা মানুষের উপর ক্ষেপেই থাকে। কেননা তাদের বসত ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। তখন তারা কোনো কোনো জায়গায় এসে ডেরা বাঁধে।

ঝারোয়ার জঙ্গল তেমনি এক জায়গা। এ কথা বাবু মানে না, বুঝে না। এ কথা কখনো বাবু ভেবে দেখল না যে ধীলন যেখানে ঘর করল, সেখানে গাছ পাখি বসে না, কোনো জানোয়ার ঢোকে না বাড়ির ভিতর? আর ধীলনও ভেবে দেখল না, জঙ্গলের মধ্যে একটা মেয়ে কোথা থেকে এল, বিয়ে করে বসল। অবশ্য ধীলন কিছু করতে পারতও না। যখনি ওখানে বাড়ি করেছে, তখনি ও মরেছে। যখনি মেয়েটিকে দেখেছে, তখন তো ওর উপর শাপ লেগে গেছে।

ও তো মেয়ে নয়। মানুষের উপর প্রতিহিংসা নেবার জন্যে বখন

মেয়ে সেজে, কখন হরিণ বা বায়ু সেজে মানুষকে ভুলায়। তারপর মানুষের রক্ত চুষে শেষ করে ফেলে রেখে চলে যায়।

কেন ?—সোনাম বলল। কেন শোধ নেবে না। মানুষ গাছ কেটে, পাহাড়ের পাথর চালান দিয়ে জঙ্গলের রক্ত চুষে নিচ্ছে না ?

তোমাদের কিছু হয়নি তো ?

দাসাইন শান্ত সুন্দর হাসল। বলল, আমরা তো জঙ্গলকে মারছি না বাবু, পাহাড় জঙ্গল শেষ করে টাকা জমাচ্ছি না। আমাদের মারবে কেন ? আমরা জঙ্গলের সন্তান। জঙ্গলের দেওদেওতার নিয়ম মেনে চলি। ওদের রাগ বাইরের মানুষের উপর। আমরা যাচ্ছি জঙ্গল দিয়ে। ধর্ কেন, জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ পথের উপর একটা ডাল ভেঙে পড়ল। বা' নেই, বাতাস নেই, ডাল পড়ল কেন ? তখনি জানলাম আর যাওয়া নিষেধ। আর যাব না, ফিরে আসব।

তাতা বলল, বাড়ি পরিষ্কার রাখছে কে ?

যে ধীলনকে খেয়েছে, সে।

কেন ? কেন ?

আরো খেতে চায় আরো মানুষ চায়।

পুলিসকে কিছু করে নি কেন ?

কে জানে ?

পুলিসকে যে কিছু করে নি, তাতেই মইনুরা নিঃসংশয় হয় যে এ কোনো মানুষের কারসাজি। তখনি বাদল ঠিক করে যে ওই বাড়িতে গিয়ে ওরা থাকবে।

কাকা বারণ করলেন। পুলিস অফিসার বারণ করলেন।

বারণ না করে, "যাও" বললে ওদের উৎসাহ ফুরাত। বারণ করার ফলে যা ছিল উৎসাহ, তা হয়ে গেল জেদ। চার চারটে জোয়ান ছেলে। সাঁতার কাটতে, স্কুটার চালাতে, পাহাড়ে উঠতে সবাই পটু। রাইফেল ক্লাবে চারজনই একসঙ্গে ঢুকেছিল। অল্পবিস্তার বন্দুক চালাতে সবাই জানে। বাদলের তো লাইসেনস্‌ও আছে। জঙ্গলের

কাজে আসার আগেই সে লাইসেনস্‌ নিয়েছে। মইনু কারাটে, তাতা আর সোনাম জুডোও শিখেছে।

পুলিস অফিসার সুজা সিং বললেন, ঠিক আছে। পাহাড়ের এপারে স্নুমাতে আমি রইলাম আজ। অনেকদিন বাদে জমিয়ে তাসখেলা যাবে।

কাকার বাংলায় রয়ে গেলেন সুজা সিং। ওরা যখন গেল বিকেলে তখন বার বার বলে দিলেন, পাহাড়ে নির্জনে শব্দ বহুদূর যায়। এই হুইস্‌ল্‌টা রাখুন। কিছু বিপদ বুঝতেই বাজাবেন। আমরা চলে যাব।

দাসাইন ওদের কিছুদূর এগিয়ে দিল আর মাথা নাড়তে নাড়তে, বক বক করতে করতে ফিরে গেল।

স্নুমা থেকে ঝারোয়া, মাঝে একটি পাহাড়। পাহাড়টা খুবই নিচু। যাবার পথ পাহাড়ের গা ঘেঁষে পাহাড় ঘিরে। ধীলনের বাংলোটিতে ওরা যখন পৌঁছয় তখন বিকেল। কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে ওরা আশপাশটা দেখতে বেরোল। বাদল বলল, যত্তসব গাঁজাখুরি কথা। ওইতো হরিণ দৌড়ে গেল, কাঠবিড়ালি ছুটছে। ভুতুড়ে জঙ্গল না হাতি!

মইনু, সোনাম আর তাতা অবশ্য কোনো হরিণ বা কাঠবিড়ালি দেখেনি। কিন্তু বাদল তো দেখেছে?

সন্ধে ঘনাতে ওরা ফিরে এল। বাদল বলল, এত বড় বড় শাল গাছ, ওঃ। কত দাম বলতো?

লাখ লাখ টাকা। তাহলে? তুই লক্ষপতি হচ্ছিস।

নাঃ, বেজায় বড়লোক হওয়াটা আর ঠেকানো গেল না দেখছি। কি আর করি বল্‌' আমাদের মাঝে মধ্যে দিয়ে দিস।

বাংলোতে আলো জ্বলছে। তাই দেখেই ওরা অবাক হয় একটু। বারান্দায় পেট্রোম্যাক্স, ঘরে পেট্রোম্যাক্স, কে জ্বালল? আরেকটু এগিয়ে আসতে জবাব মিলল। বারান্দায় বসে আছে একটি মেয়ে। তার কোলে একটি বাচ্চা।

ওদের দেখে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল বাচ্চাটিকে শুইয়ে রেখে। তারপর হাত জোড় করে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ছেলেরা যত না অবাক, তত বিব্রত, আবার আশ্বস্তও। মহীন্দ্র বলল, থামুন থামুন। কাঁদবেন না। আপনি, আপনি ধীলনের বউ?

হ্যাঁ বাবুজী। এ তো আমারই বাংলো।

কোথায় ছিলেন?

কোথায় থাকব? জঙ্গল দিয়ে আমাদের গাঁয়ে পালিয়ে ছিলাম। পুলিস যে বড্ড ঝামেলা করে। কি বলে কিছু বুঝি না। আমি কি জানি যে স্বামী মরে যাবেন? উনি পরব পূজা করেন না। ঝগড়া করে আমি বাচ্চাকে নিয়ে চলে যাই। তারপর যা যা হল···গাঁয়ে আমায় থাকতে দেয় না। বলে, বাবুকে বিয়ে করেছিলি। সেখানে যা। এখানে এলে পুলিস তাড়া করে।

আপনিই ঘরদোর সাফ করেন?

হ্যাঁ বাবুজী। কে করবে? ঘর খোলেন কি করে?

এই যে, মাসটার চাবি দিয়ে? এ চাবিগুলো দিয়ে সব তালা খোলা যায়। বাচ্চাটার বড় অসুখ। কেবল শুকিয়ে যাচ্ছে, কিছু খেতে চায় না। তাই এসে বসে আছি। ভেবেছি সকাল হলে নিজে যাব পুলিস সাহেবের কাছে। বলব, আমাকে যা বলো তাই করব, বাচ্চাটাকে হাসপাতালে দিয়ে দাও। জংলী মানুষ আমি, কিছু বুঝি না। স্বামী সব বুঝতেন, সব দেখে শুনে রাখতেন। বাবুজী রাতটুকু থাকব?

ছি ছি. সে কি কথা! আপনি বাচ্চাকে নিয়ে ঘরে থাকুন। আমরা ওই ঘরে থাকব। সকালে আমরাই আপনাকে নিয়ে যাব।

মেয়েটি বাচ্চাকে শুইয়ে এল। সেই ওদের খাবার সাজিয়ে দিল প্লেটে। কাকা খাবার সঙ্গে দিয়েছিলেন। অনেক পীড়াপীড়িতেও নিজে কিছু খেল না। কথা বলল অনেক। ধীলনের ভাগ্নে ভার্মাকে কে মেরেছিল তা ও জানে না। ও তো ভয়ের চোটে আসতই না। গ্রামের লোকরা থাকতে দিল না বলে যাওয়া আসা করছে।

বসার ঘরে ওরা শুয়ে পড়ে। ঘুম কি আসতে চায়? এখন তো ঝারোয়ার বাংলোর রহস্যের সব সমাধানই মিলেছে। মেয়েটির গল্পের

মধ্যে যে সব ফাঁকফোকর আছে তা ওদের এখন কিছু কানে বাজছে না। মেয়েটির চাউনি এত কাতর, গলার স্বর এমন কান্নায় ভরা!

হঠাৎ মেয়েটি কেঁদে উঠেছিল। ছুটে এসেছিল। বাবুজী বাবুজী! মেয়ে আমার নেতিয়ে পড়ছে কেন? একটু দেখ না গো! এমন রাতে আমি কি করি, কোথায় যাই?

ধড়ফড় করে ওরা উঠে যায়। সত্যিই, বাচ্চাটা, তিন-চার মাসের বাচ্চাটা যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। বাদল সামনে ছিল, পাগলিনীর মতো বাচ্চার মা বাদলের হাত ধরে টানতে থাকে।

এসো বাবুজী, গায়ে হাত দিয়ে দেখ, আমার মেয়ে বেঁচে আছে।

হতভম্ব বাদল এগিয়ে যায় কাছে। আর যে বাচ্চাটা মরার মত পড়েছিল এতক্ষণ, সে হঠাৎ খলখল করে হেসে বিছানা ছেড়ে যেন ভেসে উঠে আসে, বাদলের গলায় মুখ লাগায়, চুষতে থাকে কি যেন বাদলের গলার স্বর আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যায়। চোখ হয় বিস্ফারিত মইনুরা এক পা নড়তে পারে না। এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে। মেয়েটি বাদলকে ধরে থাকে আর একেবারে মমতাময় মানুষী মায়ের গলায় বলতে থাকে, খেয়ে নে সোনা, খেয়ে নে মণি, খেয়ে নে……

সোনাম এই ভয়ঙ্করতার অভিশাপ কাটিয়ে বাদলের রাইফেলটা এনে পরপর গুলি করেছিল মেয়েটির উপর। মেয়েটি একটুকু নড়েনি বাচ্চাটাকে ও একসময়ে কোলে নিয়ে নেয়, বেরিয়ে যায় ঘর থেকে বাদল পড়ে যায়।

রাইফেলের শব্দে সুজা সিং ও কাকা এসে পড়েন। তারপর সব অস্পষ্ট। ধোঁয়াটে, গোলমেলে। ওদের চারজনকেই হাসপাতালে নিতে হয়। বাদল অবশ্য জীবিত ছিল না।

তারপর ওরা একদিন ফিরে আসে।

ঝারোয়ার জঙ্গলের নাম ওরা কখনো করে না। কিন্তু খুব ছোট শিশু দেখলে ওর ভীষণ ভয় পায় আজও। জীবনেও এ আতঙ্ক ওদের কাটবে না। ঝারোয়ার জঙ্গলে এরপর আর কেউ ঢোকেনি।

জ্যান্তকালী

ছেলেটার নামও কালী, সে নাচেও কালী সেজে মুখোশ পরে। ওর বাবা এ অঞ্চলের সবচেয়ে ভাল মুখোশশিল্পী। কত রকম মুখোশ গড়তে জানেন আর কী সুন্দর সেসব মুখোশ, তা বলার নয়। খুবই দুঃখের কথা, মুখোশ গড়ে পেট চলে না। নইলে সনাতন গিরির মতো মুখোশ যদি শহর কলকাতায় বসে কেউ গড়ত, সে মান-সম্মান তো পেতই, টাকাও পেত বিস্তর। সনাতন গিরি মানুষটা ভারি নম্র আর মিষ্টভাষী। জমিটুকু চাষ আবাদ করে যে সময় পান, মুখোশ গড়েন। আশপাশের সমস্ত গ্রামে উৎসবের নাচে তাঁর মুখোশ ব্যবহার হয়।

এবার ভারি খরা গেছে। তার ওপর অসময়ে বৃষ্টি। ধানের গতিক খুবই মন্দ। সনাতন গিরি আর তাঁর মতো প্রবীণ কজনার মুখ শুকনো। আকাল এলো বলে। গ্রামের যারা মজুর খাটে, তারা বলল, পালধিবাবুরা দীঘি উদ্ধার করছে, লালমোহনবাবু কণ্ট্রাক্টর রাস্তা কাটাচ্ছে। আমাদের পাঁচ-সাতটা গ্রামের মানুষকে যদি নিত, তাহলে তো দুঃখ কিছুটা ঘুচত।

নিতে চায় না যে?

আপনারা বলে-কয়ে চাপ দাও দিকি, কেমন না নেয়? শেষে সেই রিলিফ ভরসা! রিলিফের আম যাবে লালমোহনের ভাইয়ের ঘরে, আঁটি পাব আমরা।

দেখি।

সনাতনেরই ছেলে কালী—কালীচরণ। সে ভাত খেতে খেতে কথাগুলো শুনল। তারপর বেরুল ছিপ নিয়ে। বাবা বললেন, কোথায় যাচ্ছিস?

এই রতনের ছিপটা ফেরত দিতে।

ঝপ করে আসবি। মুখোশ রঙ করলেও তো কাজ হয়। রঙট ধরালি। আমি নয় তারপর চিন্তির করলাম। বংশের কাজ একটা।

কালী নীরবে বেরিয়ে গেল। ওর চেলারা অপেক্ষা করছিল গ্রাম পেরিয়ে ডহর। ডহরটা এককালে খুব গভীর ছিল, খুব বড়ও এখন মাটি পড়ে বুজতে বুজতে ছোট হয়ে এসেছে। তবু খানিক জল তাতে থাকে। জলে মাছও আছে। ল্যাঠা, গজাড়, ময়া, টাকি মাঝেমধ্যে কালীদের ছিপে ধরাও পড়ে। ছেলে সারাদিন ছিপ নিয়ে টইটই করলে কালীর বাবা বকেন, মা কিছু বলেন না। কালী আনলে তবেই তিনি স্বামী ও ছেলেমেয়েদের পাতে একটু মাছ দিতে পারেন। কিনে খাওয়া তাঁদের সাধ্য নয়।

কালীর জন্যে ছেলেরা বসে ছিল। কালী বলল, যাঃ, আর মাছ ধরব না।

কেন?

ভালো লাগছে না।

কী হলো?

দূর! সব সময়ে শুধু এই আকাল এলো, এই রিলিফ পেলাম না! চিরকাল এক কথা ভালো লাগে?

রতন বলল, ওঃ রিলিফ মেরে মেরে গোলবদনবাবু কী ইমারত বানিয়েছে রে! এই দালান, এই চাপাকল, ভুসভুস করে জল উঠছে। দাদা জন খাটতে গেছল, বলল, এই মুড়ি জলপান, এই চিড়ে! সব বস্তা বস্তা, ডোল ডোল বোঝাই।

তবে আর কী, সে গল্প শুনেই পেটটা আমার ভরে গেল!

খ্যাঁচাচ্ছিস কেন?

ভালো লাগছে না বললাম তো।

তুই বল্‌না কী করা যায়।

রতনের ভাই মদনা। জ্বরে জ্বরে সে টিংটিঙে গলাটাও তার পিংপিঙে। সে সরু গলায় চেঁচিয়ে বলল, আমার কাকারা আকাল

হলে তোর বাবার কাছ থেকে মুখোশ চেয়ে এনে নাচ দেখাতে বেরুত যত সব তাবড় তাবড় লোকের বাড়ি। এই এ-ত চাল আনত কুমড়ো। সবাইকে বেঁটে দিত আর নিজেরা ফিস্টি করত। তুই তো কালী নাচতে পারিস?

তুই তো জ্যান্ত কালী।

চুড়োকাকা গান গাইতে পারত। আমি নাচলে গান গাইবে কে শুনি?

তাড়ু গাইবে।

তাড়ু অমনি হাত তুলে চেঁচিয়ে গেয়ে উঠল—মা নাচতে নেমেছে। দুষ্ট লোককে মারবে বলে খাঁড়া তুলেছে!

কালী বলল, এ মন্দ বলিস নি। দাঁড়া, বাবাকে বলি।

সনাতন প্রথমে রাজী হন নি। কিন্তু কালী খুব জেদাজেদি জুড়ল। বলল, দূরে দূরে যাব নাকি? কাছেভিতে ঘুরে দেখি, তেমন জুত না হলে ফিরে আসব।

মা শুধু বললেন, কোথাও কিছু বাধিয়ে এসো না বাবা! তোমার অসাধ্য কাজ নেই। না না, একটা দল বলে কথা! আমিই বড়। আমি কখনো গণ্ডগোল করি?

মুখোশ-টুখোস নিয়ে ঝোলায় পুরে ওরা ছ জন বেরোল। কালী, রতন, মদন, তাড়ু, অভয় আর বুড়ো। ওরা বাসে চেপে ভাড়া দিল না। বলল, সনাতন গিরির ছেলে আমি। কালী-নাচতে যাচ্ছি।

কণ্ডাক্টার বলল, অ্যাঁ? কোথায়?

সাম্‌তোড়। পালধিবাবুর বাড়ি।

তিনি বায়না করেছে?

রতন বলল, না না। তবে কিনা আমাদের এই কালী, মানে ওর নামও কালী কিনা, কালীনাচ নাচে ও। জ্যান্ত কালী বলি ওকে। পালধিবাবুর মা স্বপ্ন পেয়েছে, ওকে যেয়ে নাচ দেখাতে হবে। তিনিই খবর পাঠিয়ে দিলে।

কণ্ডাক্টর বলল, বাঃ ভাই, বাঃ! তা তোমাদের কাজ হয়ে গেলে একবার আমাদের ডিপোয় এসো। আমরাও নাচ দেখব।

কী দেবে?

নিশ্চয়ই কিছু দেব।

দেখা যাক।

বাস স্টপের গায়ে 'সামতোড় বাস জংশন' লেখা আছে বটে, কিন্তু গ্রামটি মাইল দেড়েক। পালধিবাবুদের পূর্বপুরুষের তৈরী একটা দীঘি মজে এসেছে। এতকাল ওঁরা মহাজনী কারবার চালিয়ে ধনী হয়েছেন, কারো জন্যে কিছু করেন নি। এবার গ্রামের পাঁচজন একরকম জবরদস্তি করে ওঁদের রাজী করিয়েছে। দীঘিটা উদ্ধার হলে এই খরার দেশে মানুষ জল খেয়ে বাঁচে। অনেক লোক-জন, ভারি হৈ-হল্লা।

কালীরা গেল বাবুর কাছারিঘরে। বাবু বসে খাতায়, হিসেব কষছিলেন। ওদের দেখে বললেন, কে তোরা? কী চাস? যা যা, মজুর আমি পেয়ে গেছি, আর লোক নিচ্ছি না।

কালীর বুক ঢিপঢিপ করছে। কিন্তু সাহস করে কথা তো তাকেই বলতে হবে। সে হলো লীডার, তার ভরসায় এরা এসেছে।

আমি চাতকের সনাতন গিরির ছেলে।

—অ। তা গিরিমশায়ের ছেলে হয়ে এদের সঙ্গে কেন? অ্যাঁ?

আমি আপনার এখানে কালী নাচব।

কী বললে?

কালী নাচব। মা স্বপ্ন দিয়েছে এখানে নাচ দেখাতে হবে। নইলে আপনার দীঘিতে জল উঠবে না।

একজন ওকে চিনল। বলল, তুমি তো খুব ভালো নাচ হে। কয়েক বছর মেলায় তোমায় নাচতে দেখেছি।

পালধিবাবু বললেন, স্বপ্ন পেয়েছে। কী দিতে বলেছেন মা?

কালী বলল, তোমার এখানে আমি নাচব না। তুমি পাপী।

পালধিবাবুকে মুখের ওপরে 'তুমি' বলা। সবাই তাজ্জব বনে গেল। এবার তাড়ু চেঁচিয়ে উঠল—এ জ্যান্ত কালী, তা জানো? নাম কালী, নাচে কালী, নাচের সময়ে ভর হয়।

পালধিবাবু ঘাবড়ে গেলেন। ওঁর ছেলে বলল, সনাতন গিরির নাম কলকাতাতেও জানে বাবা। সিনেমায় ওঁর মুখোশ তৈরির ছবি তুলেছে সরকার।

না না, নাচ হবে বৈকি! আমি কি মন্দ ভেবে কথাটা বলেছি?

অন্দর থেকে একজন এসে বলল, মায়েরা বলছেন, নাচ হবে।

কালীরা একটা ঘর পেল। ওদের জলপান এলো। রতন বলল, অ্যাদ্দুর তো সামলে নিলাম। এর পরটা ভালোয় ভালোয় যেন উতরোয়!

কালীর নাকের পাটা ফুলে উঠল। ও বলল, যেমন বেটা কালী-কালী করে, ওকে কালীর গানেই জব্দ করব।

দীঘি কাটবার কাজে জনমজুর নেওয়া নিয়ে নিত্যি গোলমাল হচ্ছে। কালী-নাচের নামে সবাই খুশী হলো। শেষ অবধি বেশ বড় আসর বসল। পালধিবাবুদের হ্যাজাক ছিলই। গ্রাম পঞ্চায়েতের সবাই এলো। সময় হতে নাচ শুরু হলো। রতন আর মদন হল কালীর চেলা যোগিনী। বুড়ো হলো শিবের চেলা দানো। শিব বড়, না কালী বড়, এ নিয়ে এক দানো বনাম দুই যোগিনীর প্রচুর যুদ্ধ হলো। শেষে বুড়ো এলো শিব হয়ে। কালী তখন ঢুকলেন। শিবকেও হার মানালেন তিনি। শিব শুয়ে পড়লেন লম্বা হয়ে। তাড়ু মাঝে মাঝে গান গাইল, মাঝে মাঝে হাতে কাঁসর নিয়ে পেটাতে পেটাতে যুদ্ধের বাজনা বাজাল। মুখোশ-নাচ এদের রক্তের জিনিস, দিব্যি উতরে গেল নাচ। এবার কালীর ওপর কালীর ভর হলো। আমাদের কালী সত্যিই ভালো নাচে। সে লাফ মেরে মেরে খাঁড়া দুলিয়ে বলে উঠল, আমি কালী!

সবাই বলল, জয় মা!

পালধিবাবু বললেন, ও দুলছে কেন ?

বুড়ো শিবের মুখোশের আড়াল থেকে হেঁকে বলল, ওর ওপর কালীর ভর হয়েছে।

জয় মা !

কালী খাঁড়া তুলে নেচে নেচে আসর পাক দিয়ে এলো। তারপর চেঁচিয়ে উঠল—সর্বনাশ হবে। পাপে ভরে গেছে সব। পাপে !

জয় মা।

এই যে পালধি ! পাপের জলধি ! আমার কথা সে শুনে না ! মানুষ মরে, খেতে পায় না, অথচ তোর গোলায় ধান ! গ্রামের মজুর ভিখ পায় না। বাইরের মজুর নাচাস। দীঘি কি তোর ? তোর পূর্বপুরুষ আমার নামে দীঘি দেয় নি ?

পালধিবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—মাকড়াচণ্ডীর নামে।

আরে রে অবিশ্বাসী, আমিই মাকড়াচণ্ডী, উনিই আমি। তোর পাপ সর্ব না—শ হবে রে।

আসরে হৈচৈ উঠল। কালী নেচে চলল খাঁড়া দুলিয়ে, লাফ মেরে। এমন নাচ সে গাঁয়ের মেলাতেও নাচে না। নাচ দেখে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল।

পালধিবাবু মোটেই খুশী হন নি। কিন্তু সবাই, বিশেষ করে তাঁর মা আর বউ, বললে, কালীর ভর না হলে ওই রোগা ছোট ছেলের মুখ দিয়ে এত কথা বেরোয় ? ভর না হলে কেউ শূন্যে উঠে পাক মেরে নাচতে পারে ?

পঞ্চায়েতের লোকরাও বলল, যা বলে তাই দিন। ওঃ, কী নাচ দেখলাম !

যদি বলে, 'সকল গাঁয়ের লোককে মজুর নাও', তখন ?

রামচরণ সর্দার পঞ্চায়েতে নতুন প্রধান। সে দাঁত বের করে বলল, পূর্বপুরুষ তো জোড়াদীঘি কাটিয়ে দিছল আপনার। পাশেরটাতেও হাল দিন। আমরাই আশপাশ থেকে লোক এনে দেব।

জ্যান্ত কালী আরো সেয়ানা। সে বলল, অ্যাঁ? এসব কথা আমি বলিছি? কিচ্ছু তো মনে নেই? না না, কিচ্ছু নেব না আপনার ঠেঙে। আমরা কি আদায় করতে বেরিয়েছি?

না বাপু, এ চাল আর খেসারির ডাল মনটাক তোমাদের নিতেই হবে।

রতন উদাস-উদাস গলায় বলল, দিন সামৃতোড় বাস জংশনে পৌঁছে দিন।

সেখান থেকে?

কালীই নেবেন ব্যবস্থা করে।--বলে রতন হাত জোড় করে ছাতের দিকে চেয়ে থাকল।

কালীরা সে রাতে পেট ভরে রুটি আর কুমড়োর তরকারি খেল উৎকৃষ্ট গুড়সহ। ঘুমোতে যাবার আগে কালী বলল, বাস জংশনেই ডিপো। এই লোকটারই বাস চলে। আটটা বাসের কণ্ডাক্টার, ক্লীনার, সে অনেক লোক। সেখানে নাচ দেখাব। যা দেয় দিলে। বস্তাগুলো তো পৌঁছে দেবে নিখরচায়। তারপর লালমোহন আর গোলবদনকে দেখতে হচ্ছে।

তাড়ু বলল, মায়ের নাম করে বজ্জাতি করাটা কি ঠিক হচ্ছে?

মায়ের নাম আবার কী? আমি তো বলেছি, 'আমি কালী।' তা, আমার নাম কি কালী নয়?

বাস জংশনে ওরা সবাই মিলে এককলসী গুড় দিল, কালীকে একটা টর্চ। বলল, যখন দরকার হবে, বাসে চেপে বসবে। কাত্যায়নী বাস সার্ভিসে তোমাদের টিকিট লাগবে না।

বাড়ি ফেরার পথে কালীকে ড্রাইভার নিজের পাশে বসিয়ে নিল। কী আনন্দ! কী আনন্দ! কালী মনে মনে ঠিক করল নাচটা এবার খুব ভালো করে শিখে নিতে হবে। বাবার কাছে মুখোশ চিত্তিরটাও। তারপর কালী নেচে সকলকে অবাক করে দিতে হবে।

বাঘা শিকারী

উমনো ঝুমনো দু' ভাইবোন সকালে উঠেই ভাত রান্নার গন্ধ পেল। মা গরম ভাত রাঁধছে। ওদের চোখ গোল গোল হয়ে গেল। মা আবার সকালে গরম ভাত রাঁধে কবে?

মা ভাত রাঁধে বিকেলে। উমনোর বাবা বাঘা শিকারী যখন জঙ্গল থেকে ফেরে তখন। তখন ওদের বাড়ি গরম ভাত রান্না হয়। তার সঙ্গে বড় বড় বেগুনপোড়া। একটা তরকারি দিয়ে বাঘা শিকারী কখনও ভাত খায় না। সেই সঙ্গে ডাল রাঁধতে হয়।

হাটে মাঝে মাঝে ছোট ছোট মাছ শরঘাসে গেঁথে বিক্রি করতে আসে মেঝেনরা। আগে এসব দেশে এত জল ছিল না, মাছও খেত না কেউ।

এখন দেশ স্বাধীন হবার পর সরকার ধানখেতের ভেতর দিয়ে খাল কেটে দিয়েছে। খাল দিয়ে দিন নেই, রাত নেই, মাছ বায়।

মাগুর, শিঙি, পাঁকাল, চ্যালা, বেলে। খলি জাল পেতে মেঝেনরা মাছ ধরে। তারপর শরঘাসের ধারালো ফলায় মাছগুলো গেঁথে নিয়ে চলে আসে হাটে। সেই মাছ উমনো ঝুমনোর মা কিনে আনে। বাড়ির উঠোনটা মস্ত বড়। সেখানে কুমড়ো, বেগুন, পেঁয়াজ, লঙ্কা, ভুট্টা, আলু হয়। কুমড়ো, পেঁয়াজ আর লঙ্কা দিয়ে উমনোর মা ঝাল রেঁধে দেয়।

বাঘা শিকারী বিকেলে ফিরে কুয়োর জল তুলে স্নান করে। তারপর ওরা চারজন আর উমনোর কাকা রান্নাঘরে একই সঙ্গে খেতে বসে। লাল মোটা চালের গরম ভাত, কাঁকরের মতো কচকচে লবণ, ডাল, বেগুন, পোড়া, লঙ্কা, মাছের বেন্নন ওরা হাপুস হুপুস করে খায়!

এক হাঁড়ি ভাত জল দিয়ে মা সিকেয় তুলে রাখে। সেই ভাত খেয়ে সকালে সবাই যে যার কাজে যায়। দুপুরে ওরা তেমন কিছু খায় না। বাঘা শিকারী চারটি চিড়ে গামছায় বেঁধে নিয়ে জঙ্গলে চলে

যায় বাজারের দিকে। এদিকে এখন রাস্তা তৈরি হচ্ছে! উমনোর কাকা পাথর ভাঙে, রাস্তা বানায়।

উমনো ঝুমনো আর ওদের মারও হাজারটা কাজ থাকে। কে আর দুপুরে খেতে আসছে বল? মা সকালে একবার উনোন জেলে কুকুর দুটো আর মুরগিগুলোর জন্যে ভুট্টা সেদ্ধ করে।

তখন ক'টা ভুট্টা আর রাঙাআলু উনোনের গরম ছাইয়ের মধ্যে গুঁজে রেখে যায়। উমনো ঝুমনো ইস্কুল থেকে এসে ঐ ভুট্টা আর রাঙাআলু ছাই ঝেড়ে খেয়ে নেয়। সকালে ওদের বাড়ি ভাত রান্না হয় না কোনদিন।

ঝুমনো বলল, দাদা, মা ভাত রাঁধছে কেন রে?

উমনো বলল, কি জানি!

তারপরই মনে পড়ল ওর। তাই ত! আজ ত জঙ্গল আপিসের মেজসায়েব শহরে আসবেন, সেইজন্যে বাবা শহরে যাবে। তাই মা ভাত রাঁধছে।

উমনো বিছানা থেকে উঠে বাইরে চলে এল। উমনোর বাবা এর মধ্যে সারা গায়ে মহুয়া তেল মেখে স্নান করে ফেলেছে। মাথায় একটা পাগড়ি বেঁধেছে। গাদা বন্দুকটা নিয়েছে সঙ্গে।

বাবা, তুমি আজ আজ আসবে না?

না।

আমাদের জন্যে কি আনবে?

দেখা যাবে।

মা বলল, লণ্ঠন একটা চাই এবার। কাচের বোতলে মোমবাতি বসালে কি ভাল আলো হয়?

দেখা যাবে। ভাত কই?

উমনোর বাবা ভাত, রাঙাআলু পোড়া, তেল লঙ্কা লবণ দিয়ে সপ সপ করে খেয়ে নিল। মা ভাতের ফেনটা ফেলেনি। ফেন-ভাত হলে খেতেও ভাল লাগে, আর পেটে ভার পড়ে বেশ।

উমনো! কথা শুনে যা।

উমনো কাছে গেল। বাবাকে ওর খুব হিংসে হয় মাঝে মাঝে বাবা শহরে চলে যায়। অজানা দেশে। সেখানে পথে গাড়ি চলে সাইকেল চলে, রিক্সা পর্যন্ত সাইকেলে টানতে হয়।

সেখানে দোকান-পাট, সিনেমা, গান-বাজনা কত কি হয় উমনোদের চনাশোনা কেউ ঘরে সন্ধ্যা হলে পিদিম অব্দি জ্বালাতে চায় না। ওরা ভোরে ওঠে, সন্ধ্যাবেলা ঘুমোয়। খুব দরকার হলে মাটির ডেলকো পিদিমে মহুয়া তেল ঢেলে জ্বালে। শহরের পথে না কি দিনে রাতে আলো ঝলমল করে। রাতকে মনে হয় দিন।

উমনো! জঙ্গলে একা যাবি না। রাঙা গাইটা আর বাছুরটা দিন থাকতে থাকতে ঘরে আনবি। খুব শক্ত করে গোহালে গাই মোষ বাঁধবি। দিন ভাল নয়। মনে রাখিস।

কেন বাবা?

দিন ভাল নয়, উমনো কথা শোন। আর শোন্! যদি খুব বিপদ আপদ বুঝিস তা হলে ঢেঁড়া বাজাবি, নইলে নয়।

আশী নব্বই মাইল দীর্ঘে প্রস্থে এই জঙ্গল।

জঙ্গলে অনেকরকম গাছ আছে। সরকার এই জঙ্গল মহলের কেঁদ, পিয়াশাল, গজাড়, শাল, শিরীষ গাছ মাঝে মাঝে কাটে আবার নতুন চারা বোনে।

জঙ্গলে জানোয়ারও অনেক আছে। মাঝে মাঝে মাঝি মেঝেনদের ছোট ছোট গ্রাম আছে, তা ছাড়া জনবসতি নেই।

এখন ঐ খাল কাটা হচ্ছে, রাস্তা তৈরি হচ্ছে, সেইজন্যে রেল লাইনের ধারে ছোট একটা বাজার বসেছে। কয়েকটা ঘরবাড়িও হয়েছে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নদী চলে গেছে। নদীর নাম পইরি। নদীর ওপারে গ্রাম একটা আছে বটে, কিন্তু উমনোর বাবা ও গ্রামে কখনো যায় না।

ও গ্রামে উমনোর বাবার অনেকদিনের শত্রু মঙ্গল থাকে। উমনোর

বাবার আসল নাম রামলাল সর্দার। অসম্ভব সাহস আর শিকারের ক্ষমতার জন্যে ওকে সবাই বাঘা শিকারী নাম দিয়েছিল।

সরকারী সায়েব ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলের তদারকির কাজটা দেন। তাতে মঙ্গলের মনে খুব হিংসে হয়। তারপর কি কি হয়েছিল সে অনেক কথা।

তবে উমনোদের উঠানে যে নিমগাছটা আছে তার ওপর একটা ঢেঁড়া বাঁধা থাকে। বুদ্ধিটা উমনোর মার। গাছে উঠে ঢেঁড়া বাজিয়ে দিলে মানুষ টের পেয়ে যায় কোন একটা জরুরি খবর আছে।

মানুষ ছুটে আসে। জঙ্গলের জরুরি খবর কি হতে পারে? হয়ত একটা বাঘ বুড়ো হয়ে ছাগল গরু ধরছে। হয়ত বনে আগুন লেগেছে। হয়ত পইরি নদীতে বান এসেছে।

রামলাল উমনো ঝুমনোকে যা বলবার বলল। তারপর উমনোর মাকে বলল, যাচ্ছি। একটু দাঁড়াও।

কেন? লখাটা ঘরে আসুক?

লখা উমনোর কাকার নাম। লখা হাঁপাতে হাঁপাতে এল। বলল, ছুটে গেছি, ছুটে এসেছি গো দাদা।

লখা মন্দিরে গিয়েছিল। পইরি নদীর ধারে ছোট একটা মন্দির আছে। মন্দিরটা হনুমানের, তবে ওখানে পুজো না দিয়ে কাঠুরেরা জঙ্গলে কাঠ কাটতে ঢোকে না। হনুমানের এতবড় লেজ আছে, উনি পবন দেবতার ছেলে কিন্তু উমনো ঝুমনোর কাকারা বলে হনুমান মাইজি।

মন্দিরের-ফুল মালা নিয়ে রামলালের গামছায় বেঁধে দিল উমনোর মা। জামার পকেটে একটা লোহার চাবি গুঁজে দিল। বলল,

খুব সাবধান! কাল তুমি নদী পেরিয়ে ওদিকে পাহাড়ে গিয়েছিলে। লখারা গিয়ে দেখে এসেছে বালির ওপর শয়তানটার থাবার দাগ, তা জান?

জয় হনুমান মাই! লখা আজ কাজে যাবি না।

আমি না আসা পর্যন্ত ঘর ছেড়ে যাবি না কেউ।

মোষগুলো তুই দেখবি। রাঙা গাই আর বাছুরটা দেখবে উমনো। ঝুমনো মুরগি ঘরে তুলিস। তোদের মা ছাগলগুলো সামলাবে।

বাঘা শিকারী চলে গেল। উমনো দেখতে লাগল ওর বাবা চলে চলে যাচ্ছে, কাঁধে বন্দুক।

উমনোর বাবার নাম কিন্তু বাঘা শিকারী নয়। আসলে ওর নাম রামলাল। ওরা চিরকাল সর্দারের কাজ করে আসছে। রামলালের বাবা রাজপুত জমিদারের কুঠি পাহারা দিত। তার বাবা সাহেবদের নীলকুঠির সর্দার ছিল।

রামলালের বাবা এই পইরি নদীর ধারে মঙ্গলদের গ্রামে থাকত। ছোটবেলা থেকেই রামলাল সাহসী। জঙ্গলে ঘুরতে ও ভয় পায় না।

রামলাল কোনদিন কথা বেশি বলে না। ও নিজের কাজ করত, খেতে চাষ করত আর শিকার করবার জন্যে পারমিট আনতে যেত জঙ্গল আপিসে।

জায়গাটা জঙ্গুলে। এখানকার জঙ্গলের কাঠ আর মধু বেচে সরকার অনেক পয়সা পায়। শহরে জঙ্গল আপিসটা মস্ত বড়। জঙ্গলের হরিণ, পাখি, বাঘ, ভালুক মারা বারণ। আগে এখানে দিনের বেলা হাজার হাজার হরিণ চরত, বাঘ ছিল কত কে জানে।

যতদিন ছামুনা নদীর দহে জল ছিল, ততদিন হাতীও ছিল জঙ্গলে। রামলাল যখন ছোট, তখন বিহারে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছিল।

ভূমিকম্পকে রামলালরা বলে ভুঁইডোলা। সেই ভুঁইডোলায় ছামুনা নদীর দহের চার পাশে যে বাঁধ ছিল, সে বাঁধ ভেঙে যায়। জলের তোড়ে ছোট ছোট গ্রাম, জঙ্গলের গাছ, জীবজন্তু, কত কি ভেসে যায়। বাঁধটা মানুষের তৈরি নয়। আপনা আপনি লাল পাথুরে মাটি জমে জমে বাঁধ তৈরি হয়েছিল।

সে বাঁধ যখন ভেঙে গেল, তখন আর কেউ সেটা ফিরে তৈরি করেনি।

জল যেখানে নেই, সেখানে হাতী থাকতে পারে না। হাতীরা

জলা জায়গায় ঘাস খায়, জলে চান করে, শুঁড়ে করে ভুস করে জল তুলে এ ওর গায়ে ছেটায়।'

ছামুনার দহ শুকিয়ে যাবার পর থেকে হাতী আর দেখা যায় না। হাতীগুলো দল বেঁধে এখান থেকে পালামৌ-এর দিকে চলে গিয়েছিল।

ঠিক সোলজারদের মতন। সে না কি এক আশ্চর্য দৃশ্য। জঙ্গলের শাল-পিয়াসাল-কেঁদ গাছ ভেঙে পরে আছে। দহেরজল বহে যাবার পর এখানে ওখানে ফাটলে যে জল জমে আছে তাই খাচ্ছে হরিণগুলো।

ভীষণ শীত। মাঘ মাস। ভূমিকম্পে মাটি ফেটে হাঁ হয়ে আছে কোথাও। কোথাও বা মাটির নিচ থেকে বালি আর গরম জল উঠে এসেছে।

তারই ভেতর দিয়ে হাতীরা সৈন্যদের মতো সার সার চলে গিয়েছিল। সবচেয়ে আগে একটা দাঁতাল হাতী। সে সর্দার হাতী। পেছনে মেয়ে হাতী, একটু বড় হাতী, আবার সবচেয়ে পেছনে আরেকটা পুরুষ হাতী সারি সারি গিয়েছিল। কোন শব্দ নেই। কোন ছটফটানি নেই। মাঝে মাঝে শুঁড় তুলে ওরা কি যেন শুঁকছিল। যেন বুঝে নিচ্ছিল, কোথায় গেলে জল পাবে।

সে ছিল একদিন। এই পইরির জঙ্গলে সম্বর হরিণ, নীলগাই, চৌশিঙা হরিণ, ভালুক, চিতাবাঘ, বড়বাঘ, নেকড়ে, হায়না, সজারু খরগোস, কত কি যে ছিল, তার সীমাসংখ্যা নেই।

জঙ্গলে জন্তুরা কিন্তু মানুষের মতো লোভী নয়। যে বাঘ মানুষ-খেকো হয়নি, সে মানুষ সহজে মারে না। বাঘ মানুষ খেতে শুরু করে সেজন্যে মানুষই অনেক সময়ে দায়ী।

কেউ শিকার করতে গেল।' দুমকরে বন্দুক মেরে বাঘের পা খোঁড়া করল বা দাঁত জখম করল বা এমন কোন জখম করল যে, বাঘ আর হরিণ-টরিণ মারতে পারে না। তখন হয়ত বাঘ মানুষ মারতে পারে।

নইলে জঙ্গলের জন্তুরা মানুষের মতো বিনা কারণে দুমদাম করে শিকার করে না। বাঘ, চিতাবাঘ চিরকালই হরিণ, নীলগাই মেরে

খেত এই পইরির জঙ্গলে। ঠিক খিদের সময়ে মারত। তাতে কটাই বা মরত। পইরির জঙ্গলের জন্তু জানোয়ারের লেখাজোখা ছিল না।

তারপর শুরু হল শিকার শিকার খেলা। বড় বড় লোকেরা রাতের বেলা গাড়ি নিয়ে আসত। গাড়ির আলোয় জন্তুদের চোখ ধাঁধিয়ে যেত। গাড়ি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি করে তারা চলে যেত।

রামলাল ছোটবেলায় দেখেছে বাবুদের হরিণের মাংস খাবার শখ হলে ওরা বিশ পঁচিশটা হরিণ জঙ্গল ঠেঙিয়ে মেরেছে। খেয়েছে একটা, অন্যগুলো পড়েই থেকেছে।

গ্রামের লোকদেরও তাতে খুব সায় থাকত। ওরা হরিণ খেত, চামড়া বেচত। জলে বিষ মিশিয়ে বাঘ মারত। বাঘের চামড়া বেচত চড়া দামে। বাঘের চর্বি বেচত কবিরাজের কাছে। কবিরাজ ওষুধ তৈরি করত। বাঘের নখ, দাঁত সব বিক্রি হয়ে যেত।

এমনি করে পইরির জঙ্গলের জন্তু, পাখি সব কমে গিয়েছিল। তারপর যখন দেশ স্বাধীন হল, তখন জঙ্গল আপিস থেকে কড়া আইন হয়ে গেল আর পারমিট ছাড়া শিকার করা চলবে না।

রামলাল পারমিট নিয়ে শিকার করত। আপিসের বাবু বলল, কি দিয়ে হরিণ মারবি?

বন্দুক দিয়ে।

তোর বন্দুক আছে?

আছে বই কি।

তারপর জঙ্গল আপিসের সায়েব বলল, আর এমন করে চলবে না। পইরির জঙ্গলের জন্যে লোক রাখতে হবে। জঙ্গলটার পূবমহল, পশ্চিমমহল, একেকদিকের জন্যে একেকজন করে অন্তত চারজন গার্ড চাই।

মঙ্গল বলল, এই রামলাল! আমি গার্ড হব। আপিসে দরখাস্ত দিয়ে এলাম।

রামলাল বলল, ভাল রে ভাল! তোরা কজন এখনো লুকিয়ে হরিণ মারিস, বাঘ মারিস, তুই হবি গার্ড?

আরে, আমি হলাম শিকারী।

শিকারী না ছাই! শিকারী কখনো চোরের মতো জলে বিষ মিশিয়ে জন্তু মারে?

মঙ্গলের গায়ের রঙ বেশ ফর্সা ওর মুখটা রাগে লাল হয়ে গেল। ও বলল, এ সব কথা তুই যদি আপিসে বলতে যাস তা হলে তোকে মেরে শেষ করে দেব।

দেখি তোর সাহস কেমন! আরে আমি যদি খবর দিই তুই লুকিয়ে গাছ কাটিস, কাঠ বেচিস?

যে গাছটা পড়ে যায় সেটা কাটি।

গাছের গোড়ায় গর্ত করে শেকড় কেটে দিস কেন। তারপর যখন পড়ে যায়, বলিস গাছ পড়ে গেছে।

জঙ্গল মহলের গ্রামের লোকেদের একটা সুবিধে আছে। বাঁশ গাছের শুকনো ডাল পড়ে থাকে অনেক। গ্রামের লোকেরা জ্বালানির কাঠ, পাতা কুড়োতে পারে, গরু, মোষ চরাতে পারে জঙ্গলে। কিন্তু গাছ কাটতে পারে না।

রামলাল এর সব খবর জেনে ফেলেছে দেখে মঙ্গল রেগে গিয়েছিল। বলেছিল পইহিরি জঙ্গলে আমি গার্ড হব। তারপর তোকে জঙ্গলে ঢুকতে দেখলে তীর মেরে দেব।

দিস! তীরটায় একটু বিষ মাখিয়ে দিস। আর শোন। তোর ঘরে সব সময়ে তো বিষ থাকে, পাঠিয়ে দিস একটু। ইঁদুর মারব।

রামলাল হেসে হেসে বলেছিল। রামলালের গায়ের রঙ বেজায় কালো, তাই ও হাসলে মনে হয়, একটা কালো ভালুক সাদা শালুক খাচ্ছে।

তারপরই সেই মজার ঘটনা ঘটল।

রামলাল চান করবে বলে তেল মাখছিল। এমন সময়ে লখা ছুটে এসে বলল,

দাদা! কালো বাছুরটা বাঘে নিয়ে গেছে।

কি করে বুঝলি ?

পাকুড় গাছে বাঁধা ছিল। দড়িটা ছেঁড়া। আর দেখলাম রক্ত পড়ে আছে ক'ফোঁটা।

বাঘ সব সময়ে ওপর পাটি নিচের পাটির একটু পাশের বড় দাঁত চারটে দিয়ে গলা কামড়ে ধরে। তাই সব সময়ে অনেক রক্ত গড়ায় না।

রামলালের চোখ লাল হয়ে গেল। বলল,

বোকাটা! জানিস না ক'দিন ধরে বুড়ো বাঘটা ছাগল তাড়ে, গরু তাড়ে? পাপুড় গাছে বেঁধে চলে এসেছিলি? বাঘের হাতে তুলে দিবি বলে?

লখা ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। ওরা যখন ছোট থাকে তখন একেকটা ছেলেমেয়ে একেকটা গাই বলদ মোষ-ছাগলের ভার নিয়ে নেয়। সবগুলোকেই চরায় কিন্তু অনেকটাকে ছোট থেকে বড় করে বলে মায়া পড়ে খুব।

লখা ভুলেই গেল ওর বোকামির জন্যে বাছুরটা বাঘে নিয়েছে। ও ভেউ ভেউ কান্না জুড়ে দিল।

ও দাদা! আমার কালী বাছুর এনে দে দাদা!

বন্দুকটা অব্দি দোকানে দিয়ে এসেছি, তেল দেবে, নলটা সেঁকে দেবে বলে! রামলাল শেষ অব্দি ওর টাঙিখানা নিল! টাঙিটা নিয়ে চলল জঙ্গলে। লখাকে বলল, তুই ঘরে থাক। আর দেখ! ভগবান আর ঝাবি যদি ঘরে থাকে ত' আমার সঙ্গে আসতে বল।

ভগবান আর ঝাবি জঙ্গলের খোঁজিয়াল। ওরা শিকারীদের সঙ্গে সঙ্গে যায়। খাবার দাগ, জন্তু টেনে নেওয়ার দাগ দেখে ওরা বাঘের কাছে শিকারীকে নিয়ে যায়। ওদের পায়ে শব্দ হয় না। দুজনেরই সাহস আছে, উপস্থিত বুদ্ধিও আছে! ভগবান আর ঝাবি বেশি দূর যায় নি। ওদের হাতে টাঙি পর্যন্ত ছিল না। রামলালকে ওরা বকছিল। বলছিল বন্দুক নেই, টাঙি দিয়ে বাঘ মারবি?

বন্দুক মঙ্গলের আছে। ও আমায় দেবে না।

শেষ অবধি ওদের নদীর এপারে রেখে রামলাল একাই চলে গিয়েছিল নদী পেরিয়ে। কালী বাছুরটা ছোট। বাঘটা ওকে কামড়ে তুলে নিয়ে চলে যায়। কালীর পেছনের পা দুটো বালি ছুঁয়েছিল। তার দাগ দেখা যাচ্ছিল।

বাঘের গর্জন হলেই রামলাল ভয় পেয়ে যায়। বুড়ো হক, বয়স বয়স হক, বাঘ ত! চিতাবাঘ নয়, ডোরাকাটা বাঘ। যার মতো সাহসী জানোয়ার জঙ্গলে নেই। এখন এ দেশে সিংহ তত নেই ত'! তাই নামে সিংহ রাজা হলে কি হবে। ভারতের জঙ্গলে বাঘই রাজা।

খাওয়ার সময়ে ব্যাঘাত ঘটলে বাঘ ক্ষেপে আগুন হয়ে যায়। রামলাল তখন বুঝেছিল, খুব বোকামি হয়ে গেছে ওর। কিন্তু, তখন আর ফিরে আসবার উপায় ছিল না। গাছে উঠে প্রাণ বাঁচাবে সে উপায়ও নেই। কেন না, জঙ্গলের এ দিকটায় শুধু শালগাছ আর শালগাছ। শালগাছ লম্বা, একহারা, সে গাছে উঠে কেউ প্রাণ বঁাচাতে পারে না। রামলাল মহাবিপদে পড়েছিল।

পেট থেকে কয়েক গ্রাম মাংস মাত্র খেয়েছিল বাঘটা। তারপরই এই ব্যাঘাত। গর্জন করে বাঘটা বেরিয়ে এসেছিল। রামলালকে দেখে ও ল্যাজ আছড়ায় আর লাফ দেয়।

রামলাল গাছগুলো বেড দিয়ে ঘুরে আসে। পইরি নদীর পাড়টা এখানে উঁচু। দ্বিতীয়বার যখন বাঘ ওকে তাড়া করে, তখন রামলাল বুঝে নেয় আজ আর ওকে বেঁচে ফেরত হবে না। হনুমান মাই! বলে ও টাঙিটা তুলে বাঘের ঝাঁপ ঠেকাতে যায়।

ওর খুব ভাগ্য যে, নদীর ধারের পাথরগুলো আলগা ছিল! বেশ গরম তখন। চৈত্র মাস। বালি, মাটি শুকনো ঝুরঝুর হয়ে গেলে পাথরের নিচ আলগা হয়ে যায়।

বাঘের থাবার টাঙি লাগে। বাঘ ঝাঁপ দিতে যে ঝোঁকটা পড়ে তার ভারেই বোধ হয় সামনের ডান থাবাটা প্রায় উড়ে যায়। ভারি

শরীর নিয়ে বাঘটা পাথর সহ গড়গড়িয়ে নিচে পড়ে যায়। তখন রামলাল মরি ত মরব, ক ঘা মেরে মরি মনে করে। ও ওপরে, বাঘ নিচ থেকে উঠছে এই দেখে কোপাতে থাকে টাঙি দিয়ে।

রামলালের টাঙি খাঁটি ইস্পাতে তৈরি। বেজায় ভারি। রামলালের কবজির জোরও সাংঘাতিক।

তারপর বাঘটা ওকে ছেড়ে চলে যায়। ভগবান আর ঝাবি এর মধ্যে বাঘের গর্জন শুনে গ্রামে চলে গিয়েছিল। মঙ্গল বাড়ি ছিল না। ওর ছেলের কাছ থেকে একরকম জোর করেই বন্দুকটা নিয়ে এসেছিল ওরা।

ওরা যখন আসে তখন রামলাল উপুড় হয়ে পড়ে আছে পাড়ে। ওর হাত আর কাঁধ ক্ষতবিক্ষত। চারপাশে রক্ত, কিন্তু বাঘ সেখানে নেই।

বাঘটা ছিল জলের কাছে। মুখ থুবড়ে। অনেক রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল ওর শরীর থেকে আর রক্ত বেরিয়ে গেলে খুব তেষ্টা পায়। বাঘটা আরেকবার তেড়ে আসতে চেষ্টা করে, কিন্তু এবার রামলাল ওকে গুলিই করে।

বাঘটাকে ওরা বেঁধেছেঁদে শহরে নিয়ে যায়। রামলালকে নিয়ে যায় হাসপাতালে। বাঘটা প্রথমবার আবার কোপ খাওয়ার পর কেন রামলালকে আর আক্রমণ করেনি, তা বোঝা যায় বাঘটার ছাল ছাড়াবার পর। ডান থাবাটা ওর প্রায় উড়ে গিয়েছিল বাঁ পায়ের নিচটা যেন ছিনে পড়া, ঘেয়ো, সরু! বাঁ পায়ের ভেতর দিক থেকে ওপরের জোড় পর্যন্ত ঘা ছিল বাঘটা।

ঘা থেকে ঝাঁটার কাঠির মতো সরু আর সূঁচল লোহার কাঠি বেরিয়েছিল আট দশটা। নিশ্চয় কেউ ফাঁদ পেতেছিল কাঠি পুঁতে। বাঘটা ফাঁদ থেকে বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু কাঠির বিষ থেকে ঘা হয়ে ওর বঁ পাটা অকেজো হয়ে গিয়েছিল।

বিষ বোধ হয় বর্ষার জলে বেশিটা ধুয়ে যায়, তাই বাঘটা মরেনি। কিন্তু কষ্ট পেয়েছিল, খুব কষ্ট পেয়েছিল।

রামলালের খুব ভাগ্য ভাল যে, বড় সায়েব টুরে এসে তখন শহরে ছিলেন। রামলাল কাঁধে হাতে ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে গিয়ে হাত জোড় করে বসেছিল। ব্বাপরে! একটা বাঘ মারা কি সহজ কথা! কত টাকা জমা দিলে তবে একটা বাঘ মারবার অনুমতি মেলে। হয়ত জরিমানা হবে ওর, নয়ত ফাটক হয়ে যাবে।

সব শুনে কিন্তু সায়েব ওকে শাস্তি দেননি। বরঞ্চ ঐ সব ফাঁদ কেমন করে পাতা হয়, কারা পাতে, সব শুনেছিলেন ওর কাছে। রামলাল যে পইরির জঙ্গল খুব ভালো চেনে তা তিনি বুঝেছিলেন। ওকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, তোমার বন্দুক আছে?

হ্যাঁ হুজুর।

কি রকম বন্দুক?

গাদা বন্দুক।

বন্দুকের পারমিট আছে?

হ্যাঁ হুজুর।

বেআইনি শিকার কর?

না হুজুর, পারমিট করে নিয়ে যাই।

জঙ্গল গার্ডের কাজ করবে?

করব হুজুর।

একটা দরখাস্ত লিখে এখানে দিয়ে তবে গ্রামে যাও। ঘায়ে ওষুধ দাও নয়ত পচে যাবে।

না হুজুর। হনুমান মাইজির কবচ আছে হাতে।

তবু ডাক্তারের ওষুধ দাও, সূঁচ নাও কয়েকটা।

সেই থেকে রামলাল বাঘা শিকারী হয়ে গেল। প্রথম ওর নাম হল বাঘা শিকারী, গ্রামে খুব সম্মান হল। বলতে গেলে ওর টাঙির ঘায়ে বাঘটা আগে কাবু হয়, পরে অবশ্য গুলি করতে হয়েছিল।

মঙ্গল এত রেগে যায় যে, আমায় বন্দুক কেন দিয়েছিলি, বলে নিজের ছেলেকে বেদম পিটে কাঁদিয়ে ছাড়ে।

তারপর রামলাল যখন গার্ড হল, তখন গ্রামের সবাই বলল, একটা ভোজ দে রামলাল!

দেব।

ভাল ভোজ। বাবুদের কাছারিতে যেমন হত, তেমনি।

তোরা রাঁধবি তবে?

আমরা কেন? পরমেশ্বর রাঁধবে।

রামলাল টাকা দিল। পইরি গ্রামের সবাই খুব আনন্দ করে ভাত, মাংস, ছোলার ডাল, মোটা মোটা পুরি আর বোঁদে খেল।

মঙ্গল কিন্তু নেমন্তন্ন খেতে এল না। মঙ্গল রামলালের সঙ্গে দেখা করতে এল একদিন সকালে।

রামলাল উঠোনে বসে কাঠ চেঁছে দা, কুড়োলের হাতল তৈরি করছিল। উঠোনে একটা লম্বা ছায়া পড়ল। মঙ্গল মানুষটা লম্বা মাঝে মাঝে ও লাঠি নিয়ে হাঁটে।

রামলাল মুখ তুলে দেখল, মঙ্গল লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রামলাল ওর চোখে চোখে চেয়ে রইল।

কিছুক্ষণ কেউই কথা বলল না। তারপর মঙ্গল বলল, রামলাল তোর একটা ধার রয়ে গেল আমার কাছে। আমার বন্দুক নি আমার গুলি দিয়ে তুই বাঘটা মেরেছিলি।

গুলির দাম আমি দিয়ে দেব।

মঙ্গল হাসল। বলল, না রামলাল। গুলির দাম আমি না। গুলিও ফেরৎ নেব না। সেই কথাটা তোকে বলে গেলাম

মঙ্গল পেছন ফিরল। রামলাল দেখতে পেল, ওর চুলের মা একটা ছোট লোহার চিরুণি গোঁজা। দেখে ওর বুক শুকিয়ে গেল ও রাতে উমনোর মাকে বলল, মঙ্গল আমার ওপর ডাইন কর আমি দেখলাম, ওর চুলে লোহার চিরুণি।

কি সর্বনেশে কথা গো! আমরা এখানে থাকব না।

গ্রামে ওদের থাকতেও হল না। জঙ্গলের গার্ড ছিল না, গা

থাকবার ঘরও ছিল না। জঙ্গল আপিসের লোকেরা কুলি নিয়ে এসে রামলালকে দুখানা ঘর বেঁধে দিয়ে গেল। কুয়োটা এখানে আগেই খোঁড়া হয়েছিল। নদীতে সবসময়ে জল থাকে না। তখন কুয়োর জল থেকে খাল কেটে গড় ভরে দিতে হয়। জল ছাড়া কি জানোয়ার বাঁচে?

সেই থেকে রামলাল এখানে থাকে। কিন্তু মঙ্গল যে ওকে ডাইন করবে সে ভয় ওর এখনো যায়নি।

রামলাল, লখা, মঙ্গল, ভগবান, ঝাবি, পইরি গ্রামের মানুষগুলো ডাইনী ভূত-মন্ত্র এই সবে বড় বিশ্বাস করে।

এমনিতে ওদের সাহস খুব। জঙ্গলে একা চলে যাবে। বাঘের মুখে পড়লে ভয় পাবে, আবার বাঁচবার জন্যে যুদ্ধও করবে। কিন্তু, অন্ধকার রাতে যদি হঠাৎ নাম ধরে ডাকে, ওরা বলবে ভূত ডাকছে।

গ্রামে দু' একজন ছাড়া সবাই লেখাপড়া শেখে না। আগে কাইথি হিন্দিতে পড়তে লিখতে পারলেই বেশ কাজ হত। এখন অবশ্য সাত মাইল দূরে ইস্কুল হয়েছে একটা। চার পাঁচটা ছোট ছোট গ্রামের ছেলে মেয়েরা সেখানে পড়তে যায়।

উমনো ঝুমনোও যায়। রামলালের খুব ইচ্ছে, উমনো লেখাপড়া জানলে, মহাজন ঠকিয়ে নিতে পারে না। কাজকর্ম পেতে সুবিধে হয়।

পইরি গ্রামের সবাই অবশ্য ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে চায় না। ওদের ছেলেমেয়েরা শহরের ছেলেমেয়েদের মতো হয় না। ওদের ছেলেমেয়েরা এই এতটুকু বয়স থেকে কেউ কাঠ কুড়োয়, কেউ খেতের কাজে সাহায্য করে, কেউ গরুকে খেতে দেবার পাতা কাটে।

কুয়ো আছে গ্রামে একটা। তবে নদীর জলই ওরা বেশি ব্যবহার করে। জল আনা ওদের একটা বড় কাজ। বাড়ির খেতের বেগুন-মূলো-লঙ্কা-কুমড়ো, মুরগির ডিম এ সব হাটে বেচতে যায় ওরা বড়দের সঙ্গে। তাইত, পঞ্চায়েত আপিসের লোক এসে ওদের বলে,

ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাস না কেন?

ওরা বলে, ওরা স্কুলে পড়লে এ সব কাজ করবে কে?

পঞ্চায়েত আপিসের লোক বলে,

ভোরে যাবে পড়তে। দশটার মধ্যে ঘরে চলে আসবে। আসবার পর কাজকর্ম করবে। তোরা যদি ছেলেমেয়ে না পাঠাস, তা হলে ইস্কুল থাকবে না।

এখানে ছাত্র না জুটলে এই জঙ্গলে ইস্কুল চালাবে কেন সরকার?

ইস্কুলে পড়ে কি হবে?

ভালো হবে। ওরা ভালো কাজ করবে। ওরা কি তোদের মতো কোমরে একটা কালো সুতো বেঁধে, হাঁটু অব্দি কাপড় পরে জঙ্গলে কাঠ কুড়োবে? আর, এ ইস্কুলেত' পাঁচটা ক্লাস। খানিকট শিখবে, তাওত' ভালো।

তারপর?

যে আরো পড়তে চায়, সে মহকুমায় যাবে।

উমনো, ঝুমনো, পইরি গ্রামের ছেলেমেয়েরা হাটে যাবার পথ ধরে দল বেঁধে স্কুলে যায় ভোরে। মাস্টার ওদের পড়ায়, ছেলেমানুষ মাস্টার। লখার মতো বয়স হবে। দশটার সময় স্কুল ছুটি হয়ে গেলে মাস্টারও নিজের গরু চরায়, নিজের খেতে চাষ করে।

লেখাপড়া অনেক জানলে ডাইন-ভূতমন্ত্রের ভয় থাকে না। তা রামলাল জানে। রামলালরা আপিসের বড় অফিসারদের সায়েব বলেই কথা কয়। রামলালরা জানে সায়েবরা আসলে ভারতীয় হলেও খুব সাহসী। ওরা ডাইনীর কথা শুনলে হ্যাট ম্যাট-ক্যাট বলে হেসে উড়িয়ে দেয়।

রামলালের অত সাহস কেমন করে হবে? রামলাল যে ছোটবেলা থেকে শুনেছে, জঙ্গলের একেকটা জায়গায় জিন পরীরা আসে রাতের বেলা। ওরা মানুষকে মেরে ফেলে ভুলিয়ে ভালিয়ে। ধর, তুমি ঘরে শুয়ে আছ, হঠাৎ শুনলে বাইরে একটা ছোট ছেলে কাঁদছে

পথ ভুলে গেছি গো! রাতটা থাকতে দাও না গো!

যেই তুমি দোর খুললে অমনি দেখলে, একটা ছোট ছেলে বসে কাঁদছে। তুমি নিচু হয়ে তাকে যেই কোলে নিলে, অমনি ছেলেটা একটু একটু হাসতে লাগল, আর কচি কচি আঙুল দিয়ে তোমার গলা টিপতে লাগল। তুমি দেখলে, ওর আঙুলে সাঁড়াশির মতো জোর। ভয়ে তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলে।

রামলাল শুনেছে, যদি কেউ কাউকে খুব হিংসে করে, অথবা কারো ওপর শোধ নিতে চায়, তা হলে সে তার ওপর ডাইন করে। ডাইনি করব ঠিক করলে চলে যেতে হয় জঙ্গলের ওপারে। নদীর বাঁকে যেখানে একটা মন্দির আছে।

সেখানকার পুরোহিতকে সব বলতে হয়। পুরোহিত রাজি হলে মন্ত্র পড়ে, মন্ত্র শিখিয়ে একটা লোহার চিরুণি মাথায় গুঁজে রাখতে দেন। সেই চিরুণি যতক্ষণ তোমার মাথায় থাকবে ততক্ষণ তুমি আশ্চর্য সব কাণ্ড করতে পার।

তুমি ঘরে বসে থাকলে। কিন্তু তোমার শত্রুর গাছের ফল পচে যাবে। খেতের ধান ঝরে যাবে। গাই-মোষকে সাপে কামড়াবে।

সবচেয়ে ভয়ের কথা কি জান? ধর, তুমি কোন একটা জন্তু মেরেছ। হরিণ বা খরগোস বা হায়না বা বাঘ বা ভালুক।

যা মেরেছ, সেই জন্তুর যে কোন একটার আত্মাকে ডেকে আনা যাবে ডাইন মন্ত্রে।

সেই আত্মা জীবন্ত জন্তু হয়ে তোমার পেছনে পেছনে ফিরবে। হয় সে তোমার ঘাড় মটকাবে, নয় তুমি ভয়ে আঁৎকে মারা যাবে।

রামলাল ভয় পেল কেন?

আজ ক' দিন ধরে রামলাল ডিউটি করতে যায় জঙ্গলে। ও চলে আসবার পর, ভোরে অথবা সন্ধ্যায় দেখা যায়, ওর চলাফেরার পথের চার পাশে বাঘের থাবার দাগ।

জঙ্গলে বাঘ থাকবে এ কথা যদি বল, তাহলে বলতে হয়, বাঘ জঙ্গলেই থাকে, কিন্তু মানুষের চলাফেরার পথে হরদম ঘোরে না।

রামলাল আগে ভয় পেয়েছিল অন্যরকম। মঙ্গল যদি ওকে জঙ্গলে ঢুকে মেরে রাখে? যদি নদীর জলে বিষ মিশিয়ে, ফাঁদ পেতে জন্তু জানোয়ার মারে গাদা গাদা? মঙ্গল তার কিছুই করে নি।

তবু, আজ ক'দিন হল জঙ্গলে যেন কি শুরু হয়েছে। এখন বৈশাখ মাস। দিনে গরম, রাতটা তত গরম নয়। জীবজন্তু জল খেতে আসে কয়েকটা বাঁধা ধরা জায়গায়। হরিণ বড় লবণ খেতে ভালবাসে, তাই ওদের জন্যে লবণ মাটি মিশিয়ে রাখা রামলালের আরেকটা কাজ।

ক দিন ধরে গ্রামের আশেপাশে হরিণের মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছে সমানে। হরিণ মেরে কে যেন ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে! মানুষে মেরেছে বলে মনে হয় না। কেননা, কোন জন্তু যেন বড় বড় নখে ছিঁড়ে রেখে গেছে, এই রকমই ছেঁড়া-খোঁড়া মৃতদেহ। আর পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে। বাঘের থাবার দাগ। বাঘ বাঘ দেখতে পায় নি কেউ।

যদি মঙ্গল হত, তাহলে বোঝা যেত, রামলালের সঙ্গে শত্রুতা করছে। কিন্তু মঙ্গলের জ্বর, গায়ে ব্যথা। ও ঘরে শুয়ে থাকে, আর ওষুধ খায়।

তাই রামলাল ভয় পেয়েছে। ডাইন লাগিয়েছে মঙ্গল? সেই বাঘটার ডাইন?

তাই রামলাল উমনোদের সাবধান করে দিয়ে শহরে চলে গেল।

রাঙা গাইয়ের বাছুরটা নিখোঁজ হল ঠিক দুপুরের পর। বড় পাজি আর ছটফটে বাছুরটা। জঙ্গলের কাছে ঘর হলে গাই-বাছুর সাবধানে রাখতে হয়। যেখানে চোখ পড়ে সেখানে বেঁধে রাখতে হয় বা চরাতে হয়। রাঙা গাইয়ের বাছুরটা শুধু পালাতে চায়। নদীর ধারে কচি কচি পাতা খেতে চায়!

বাবা উমনোকেই ভার দিয়ে গিয়েছিল।

উমনোর মা বেজায় রেগে গেল। বলল,

-বাঘটা ডাইন হয়ে বাবাকে তাড়া করেছে। বাছুরটা গোভূত

হয়ে তোকে লাথি মারবে আর মেরে ফেলবে। কি খেলায় মন তোর উমনো? মাটির ঐ মারবেলগুলো আমি ফেলে দেব কুয়োতে। তোর বয়সে বাবা খেতে গিয়ে কাজ করত। তুই ইস্কুলে পড়িস বলে কাজকর্মে একেবারে মন নেই।

উমনোর খুব ভয় হল। ও বলল, বাছুরটা নিশ্চয় জঙ্গলে গেছে। আমাকে লাঠি দাও একটা।

একা যাবি না।

তবে কি ঝুমনোকে নিয়ে যাব?

উমনো জঙ্গলের দিকে রওনা হল। যেতে যেতে ও দেখল, রাঙা গাইটা ঘাস খাচ্ছে কাছেই।

বাছুর সামলে রাখতে পারিস না? বলে উমনো রাঙীটিকে বাড়ি রেখে গেল এসে। মাকে বলল, রাঙীটাকে বেঁধ মা। আমি যাব আর আসব।

উমনো জানে বাছুরটা জঙ্গলের ভেতর ছায়া জায়গায় কচিপাতা খেতে কত ভালবাসে। ওরা, ওর সমবয়সী ছেলেরা জঙ্গলের ভেতরে গাইবাছুর চরাতে আসে, ওরা জানে। এখন ঐ ডাইনের ভয় হওয়াতে ছেলেরা আর আসছে না।

উমনো জঙ্গলের ভেতরে ঢুকতে লাগল। ও জানে বাছুরটা কোথায় যেতে ভালবাসে। জঙ্গলের ভেতর পইরি নদীর বুকে বাবারা একটা গভীর দহ খুঁড়েছে। দহটার দেওয়ালে গাছের ঘেঁষাঘেঁষি করে বসানো হয়েছে।

দহ মানে একটা অগভীর, চওড়া কুয়ো বললেও হয়। এইটায় জল জমে বর্ষায়। ভেতর ছায়াঢাকা জায়গা বলে গরম পড়লেও জল শুকিয়ে যায় না। এই জলে জানোয়ারেরা আসে।

পাড়ে একটা ঘর করা হয়েছে। কাঠের ছোট ঘর। সেখানে বসে চাদনী রাতে দেখা যায়, হরিণ জল খাচ্ছে। চিতাবাঘ জল খাচ্ছে।

এই জায়গাটা উমনোর বন্ধুদের খুব প্রিয়। জীবজন্তু জল খায়

ঠিক সাঁঝ বরাবর। উমনোরা আসে দুপুরে। এখানে বসে গল্প করে। শালপাতার ওপর কাঁচা আম লবণ মেখে নিয়ে কচাকচ খায়।

বাছুরটার এ জায়গাটা বেশ চেনা।

জায়গাটা জঙ্গলের অন্তত এক মাইল ভেতরে ঢুকে। এই এক মাইল রাস্তা উমনোর কাছে কিছুই না। ওদের ইস্কুলে দৌড়ের রেস হয়। ও হরিণের মতো দৌড়তে পারে। কতদিন ও ছুটে চলে এসেছে এখানে।

কিন্তু, অন্যদিন এখানে অন্য ছেলেদের গলার আওয়াজ শোনা যায়। গাই-বাছুর মটমট কচি ডাল ভাঙে, পাতা ছেঁড়ে। বুড়িরা কাঠ কুড়োয় আর আঁটি বাঁধে। জঙ্গলে কেউ জ্বালানি কাঠ কেনে না কুড়িয়ে নেয়।

আজ কোন শব্দ নেই। বাছুর খোঁজার ঝোঁকে ভেতরে চলে এসে এখন উমনোর খেয়াল হল ও যেন একা। বড় একা। জঙ্গল যেন বড় নিশুতি। ও পা টিপে টিপে এগোতে লাগল। একবারটি ঘাটা দেখবে। তারপর ও ছুটে ফিরে চলে যাবে। উমনোরা আসে আর যায়, আসে আর যায়, তাই বনের পথঘাট খুব চেনে। উমনো ওদের বাবার ছেলে, তাই জানে, কেমন করে নিঃশব্দে বনে হাঁটতে হয়।

চুপি চুপি এল বলেই উমনো সেই আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখতে পেল।

ঘটনার সামনে নদীর বুকে বালির ওপর বাছুরটা পড়ে আছে। বাছুরটার শরীর থর থর করে কাঁপছে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে মঙ্গল। পাশে ওর বন্দুক।

মঙ্গলের হাতে লোহার ওটা কি? নখের মতো বাঁকানো। মঙ্গল নিচু হয়ে বাছুরটার কচি গা নির্মম দেখে ছিঁড়ল। গুলিটা বের করে নিল তারপর আরো কয়েকটা আঁচড় দিল বাছুরটার গায়ে। দিতে দিতে বলল, এমনি করেই তোর মনিবকে মারব জানলি? আমি ওর ডাইন।

খুব নিচু গলায় বলল মঙ্গল। সেইজন্যেই ভয় করল উমনোর।

এত ঠাণ্ডা গলায় কেউ মানুষকে মারবার কথা বলতে পারে? ভাবতে পারে? উমনোর গলার কাছে ব্যথা করল। বাছুরটা মঙ্গলবার হয়েছিল গো! ওর জন্মের কদিন পরেই উমনো ওকে দেখতে শুরু করে। কিন্তু বাঘের থাবার দাগ?

মঙ্গল গুলিটা পকেটে ভরল। বন্দুক বগলে নিল। লোহার নখটা রাখল আর একটা পকেটে। পইরি গ্রামে দর্জি নেই। মহকুমার দর্জিরা খুব ভালো। ওদের ভাল করে বললে ওরা এত এত পকেট তৈরী করে দেয় জামায়।

মঙ্গল হাঁটতে লাগল আর পিছন ফিরে দেখতে লাগল। এখন উমনো দেখল মঙ্গল লাঠি দিয়ে দাগ বসাচ্ছে, নিজের পায়ের দাগ মুছে দিচ্ছে। তবে ওর ঐ লাঠির নিচেই বাঘের থাবার নকশা কাটা? উমনো হঠাৎ ভীষণ ভয় পেল আর পেছন ফিরে ছুটতে শুরু করল।

মঙ্গল বাঘের মতোই চেঁচিয়ে উঠল। লাফিয়ে উঠে এল মঙ্গল, কিন্তু উমনো ততক্ষণে গাছের ছায়া দিয়ে, গলিপথ দিয়ে বাড়ির দিকে ছুটছে।

মঙ্গলকে ওরা জঙ্গল অপিসে ধরে নিয়ে গেল। সেখানে ওকে খুব ধমক ধামক দেওয়া হল। শোনা গেল, কোনদিন পইরির জঙ্গলে ঢুকতে পারবে না মঙ্গল আর বন্দুক রাখতে পারবে না কাছে।

উমনোর খুব প্রশংসা হল। সবাই বলল, উমনো নাকি বড় হয়ে বাবার মতোই জঙ্গলে কাজ করবে আর মস্ত বড় শিকারী হবে।

উমনোর মা বলল, তোর বাবার চেয়েও বড় শিকারী হবি তুই।

উমনো ত' হেসে বাঁচে না। ওর বাবা বাঘা শিকারী। বাঘা শিকারীর চেয়ে বড় শিকারী কেউ হতে পারে? মা কি করে জানবে। মা ত' আর ইস্কুলে পড়ে না!

ভুতুড়ে ছবি

ভূতের গল্পের বেলা সবচেয়ে মৌতাতী জিনিস হল, যিনি বলছেন, তিনি সব সময়ে বলবেন, 'আমি দেখিনি বা জানিনা, তবে অমুক বলেছিলেন……

শুনতে শুনতে ছোটবেলা খুব দুঃখ হত। আমাদের পরিবার মস্ত বড়, অনেক আত্মীয়-স্বজন। এর বাড়ি তার বাড়ি অনেক ভূতের গল্প শুনতাম আর ভাবতাম, আমাদের বাড়িতে কেন ভূত নেই। সব সময়ে অন্য লোকরা ভূত দেখে কেন? এও জানতাম, ভূত যদি একটা চলেও আসে, মার ভয়ে সে পালাবে।

আমার মা ভয়ডর জানতেন না। এই ছোটখাট টুকটুকে সুন্দর মানুষ, জীবনে চেঁচিয়ে কথা বলেন নি, সাহস ছিল দুর্জয়। একবারের কথা বেশ মনে পড়ে।

বহরমপুর। বাবা ট্যুরে। গ্রীষ্মকাল। কয়েকদিন ধরে আকাশ কালো করে মেঘের ছোটাছুটি। যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝড় চলেছে। সন্ধেবেলা সেদিন তুমুল দুর্যোগ। ঠাকুর বাড়ি গেছে, চাকর ছুটি নিয়েছে। মা আর আমি। তখন বহরমপুরে আমাদের পাড়ায় তখন ইলেকট্রিক আসেনি। বড় ঘরে পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। মা বললেন। "আমি রান্নাঘর থেকে খিচুড়ির হাঁড়িটা নিয়ে আসি, এই ঘরে খাওয়া হবে।"

বাড়ির ভেতরটা বড় হাতের ইংরিজী 'এল্' অক্ষরের ছাঁদের। সামনে উঠোন, কোণে গোয়াল ও বাথরুম। সবটা পাঁচিলে ঘেরা। বারান্দার শেষপ্রান্তে রান্নাঘর। এই ভীষণ দুর্যোগে পাড়ায় সব বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ। বাতাসের গর্জন ও বৃষ্টির শব্দ এমনই যে চেঁচিয়ে মরলেও কারো সারা মিলবে না।

হঠাৎ মা ডাকলেন, "খুকু! এদিকে এস।" গলাটা কেমন যেন। মা কখনো এমন গলায় ডাকেন না।

গিয়ে দেখি মা হাঁড়ি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন, "তুমি তো প্লেট-গ্লাস নিয়ে যাবে? পেছন ফিরে দেখে নাও। চমকে যেও না। এখন দেখে নিলে চমকে গিয়ে সব ফেলে দেবে না।"

পেছন ফিরে দেখি, বাথরুম ও রান্নাঘরের মাঝামাঝি পাঁচিলের যে অংশ, সেখানে এক অতিকায় মেয়ে দাঁড়িয়ে খোলা চুল জড়াচ্ছে, আবার খুলে দিচ্ছে।

মা বললেম, লণ্ঠন নিয়ে কাছে যাও।"

বৃষ্টিতে উঠোনে নামলাম, কাছে গেলাম। মা হাঁড়িটা নামিয়ে আমার সঙ্গে নামলেন। বললেন, "দেখ, ঘর থেকে পেট্রোম্যাক্সের আলো পড়ছে। সাদা পাঁচিল। বাঁশঝাড় দুলছে পেছনে। তারই ছায়া পড়ে অমনটা দেখাচ্ছে। এই দেখে যদি কাছে গিয়ে না দেখতাম, তাহলেই ভূতের ভয় পেতাম।'

এই রকম যাদের মা, তাদের পক্ষে বাড়িতে ভূত দেখার আশা দুরাশা বই কি। অথচ আমার বেলতলা স্কুলজীবনের বন্ধু নীলনলিনীদের বাড়িটা কি ভাল ছিল। ওদের বাড়িতে একশো বছর ধরে যতজন মারা গেছেন, সবাই ভূত হয়ে বাড়িতেই থাকতেন। নীলনলিনী অন্য স্কুলে পড়ত, যেতে-আসতে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব।

পূজোর সময়ে ওদের ঠাকুরদার ঠাকুরদা ছবি থেকে নেমে এসে পূজোর কাপড়ের ফর্দ লিখে দিতেন, অসুখ হলে ঠাকুরদার দুই দাদা ছবি ছেড়ে নেমে ডাক্তার ডেকে দিতেন। পঞ্চাশ বছর আগে মরে যাওয়া দরোয়ান রাতে সব দরজা বন্ধ আছে কিনা দেখত। একবার পূজোর সময় মাঝরাতে বেজায় ভূতুড়ে ঝগড়া।

গোলাপী ঝির ভূত চেঁচাচ্ছে, 'বরাব্বর আমি বাসন মেজে রাখি, তুই কে রে?' নতুন ভূত ক্ষীণ স্বরে বলল 'আমি নন্দর মা! নতুন মরিচি, জানি নি যে বাসন তুমি মাজবে।'

গোলাপী ঝির ভূত বলল, 'কর্তাঠাকুমার কাছে জেনে নে কি করবি। বাসনে হাত দিস না।'

নীলনলিনীরা যখন হাজারীবাগ বা পুরী বা শিলং বেড়াতে যেত, ওদের ঠাকুমা যেতেন 'তোমরা রইলে, সব দেখেশুনে রেখো।'

ভূতরাই বাড়ি পাহারা দিত। আমাদের মনে হত সবই নীলনলিনীর গল্পকথা! কিন্তু সবাই বলত কথাগুলো সত্যি। এমন শিক্ষা সম্ভবৎ ছিল ভূতদের যে যারা ভয় পায় তাদের সামনে কখনো দেখা দিত না। বাড়িতে নতুন জামাই বা বউ এলে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হত। ভয় পেও না। ভয় পেলেই ওরা উধাও হবে, তখন সংসারের কাজকর্ম চালাতে মহামুশকিল হবে।

নীলনলিনীর বর ছবি ছেড়ে ঝুপঝাপ করে পূর্বপুরুষদের নামে ওকে আশীর্বাদ করতে দেখে এমন ভয় পেয়েছিল যে যত ভূত সবাই গা-ঢাকা দিল। পরে শুনি, যে কয়দিন নীলনলিনীর বর থাকে, সে কয়দিন কোন ভূত দেখা দেয় না। ফলে সংসারের খাটুনি খাটতে খাটতে সকলের প্রাণ বেরিয়ে যায়।

আমাদের বাড়িতে ও সবের বালাই ছিল না। রাজসাহীতে ঠাকুরদার বাড়ি ছিল লাইব্রেরির ঠিক পাশে। দেড়শো বছরের পুরনো বাড়িতে আমরা থাকতাম। বাইরে একটা নতুন বাড়ি করেছিলেন ঠাকুরদা। সে বাড়িতে বাড়ির লোকজন ঘুমোলে কিছু দেখতে পেত না। আমাদের মানুষ করা চাকর নন্দ ও বাড়িতে ঘুমোতে গেলেই দুটো ভূত এসে ওকে নাচ দেখাত। বাচ্চা ভূতটা ওকে চিমটি কেটে জাগিয়ে রাখত, বুড়ো ভূতটা নাচত।

আমি আর ঋত্বিক দিনের পর দিন মোমবাতি জ্বেলে নতুন বাড়িতে পড়াশোনা করার ছলে বসে থেকেছি, একটা ভূত দেখেনি।

কিন্তু ভূতের ছবি দেখেছি।

ঢাকাতে মামা বাড়িতে আছি। একদিন এক ভদ্রলোক এসে নিচে দাদুর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। তাঁর ঢাকাতে কি কাজ আছে। কয়েকদিন থাকবেন দাদুর বাড়ি। ওঁর সঙ্গে একটা ছবি ছিল, দিদিমাকে দেখতে দিলেন। ছবিটা আমরাও দেখলাম।

ছবিটা কলকাতার সবচেয়ে বিখ্যাত স্টুডিওতে তোলা। সায়েবদের দোকান। দিশী ভূতের ছবি তোলা তাদের মনেও ছিল না। ছবিতে একজন বছর আটাশের ভদ্রলোক, চমৎকার চেহারা, ধুতি পাঞ্জাবী পরা, কাঁধে জোড়াশাল চেয়ারে বসে আছেন। পাশের চেয়ারে বছর ষোল বয়সের বউ, ওঁরই স্ত্রী কোলে বছর তিনেকের একটি ছেলে।

দুজনের চেয়ারের মাঝখানে সামান্য ফাঁক। সেই মাঝখানে, বেশ শূন্যে, এক মহিলা দাঁড়িয়ে। মাথার চুল ওপর পানে উঠে মিলিয়ে গেছে, মহিলা শূন্যে ভাসছেন, দু হাত দু দিকে ছড়িয়ে ঝুলছে চোখের দৃষ্টি খুব জ্বলজ্বলে। এঁর হাতের আঙুল গুলোর ঠিক নিচে, আরো দুজন মহিলার ভাসমান চেহারা। তিনজনেই শূন্যে দাঁড়িয়ে আছেন।

দিদিমারা বললেন, 'এই সেই ছবি!' ভদ্রলোক বললেন, 'হাঁ।'

পরে দিদিমা আমাদের কাছে ছবির রহস্য বললেন। ছবির শিশুটি হচ্ছেন এই বছর চল্লিশেকের ভদ্রলোক। পুরুষটি ওঁর বাবা, বউটি ওঁর বিমাতা। ওঁর বাবা উত্তর বঙ্গের এক ধনী জমিদার। খুব অল্প ওঁর বিয়ে হয়। বছর পঁচিশ যখন ভদ্রলোকের বয়স তখন ভদ্রলোকের স্ত্রী, একটি ছেলের জন্ম দিয়ে মারা যান।

শিশুকে মানুষ করার জন্য একটি মা দরকার। এঁকে, ধরা যাক ক-বাবুকে, আবার বিয়ে দেওয়া হয়। তখনকার নিয়মমত দশ বছরের মেয়ে নয়, পনের বছরের বড়সড় মেয়ে। বাচ্চা মানুষ করতে করতে হবে তো! ধরা যাক, সেদিনের বাচ্চাটি আমার দেখা খ-বাবু। নতুন মা খ বাবুকে কিন্তু তেমন ভালবাসতে পারেন নি। হঠাৎ, দু দিনের জ্বরে তিনিও মারা গেলেন।

ক-বাবুর মাথার ওপর ঠাকুরদা-ঠাকুমা বাবা-মা? বয়সও সামান্য। কে তাঁর আপত্তি শোনে? আবার তাঁকে বিয়ে করতে হল। এবারও কপাল দোষে শিশু নতুন-মার মন পেল না। সে বলেই দিল। বাচ্চা কাচ্চা আমার ভাল লাগে না। ও আমি পারব না'

দু-দিনের জ্বরে এ বউও মরে গেল। ক-বাবুর ঠাকুমা কলকাতায়

চলে এলেন। দেশে ঘরে ওঁদের বাড়ি সম্পর্কে নানা কথা রটে গেছে। দু বছরে তিনটে বউ মরে যায় যার, তার হাতে মেয়ে দিতে চায়না কেউ। ক-বাবুও বিয়ে করতে নারাজ। ঠাকুমা সেকথা শুনবেন কেন? ক-বাবু বাড়ির একমাত্র ছেলে। তিনি বিয়ে না করলে সংসারটা শ্মশান হয়ে যাবে। দেশে বউ না মেলে, কলকাতায় দেখেশুনে তিনি মেয়ে যোগাড় করবেন। মেয়ের বাড়িতে তিনটে বউ মরার কথা বলে কয়ে সব জানিয়েই বিয়ে দেবেন।

কলকাতায় ওঁদের কোন দূরসম্পর্কের আত্মীয়া একটি মেয়ের খোঁজ দিলেন। ক-বাবুর সঙ্গে এর বিয়ে হল। ক-বাবুর বয়স আটাশ, ছেলের বয়স আড়াই। বউটি খুব শান্ত আর মমতা পরায়ণা। খ বাবুকে সে খুব আদর-যত্নে আপন করে নিল।

বিয়ের মাস ছয়েক বাদে সবাই দেশে ফিরবেন। ফেরার আগে বিলিতী দোকানে ছবি তোলা হল। ছবির নেগেটিভে আরো তিনটি মূর্তি দেখে সবাই হতভম্ব। আবার ছবি তোলা হল। আবার দেখা গেল তিনজন স্ত্রীলোক। তিনবার ছবি তুলতে তিনবারই ফল হল একই। ক বাবুরা বুঝলেন। এ কাদের ছবি।

কেমন করে এ সম্ভব হল, তা নিয়ে ফোটোগ্রাফার সাহেবই খুব মেতে ওঠেন। তিনি বিলেত ও আমেরিকার প্রেত চর্চা-বিশারদদের কাছে ছবি পাঠান। সার আর্থার কোনান ডয়েলও এ ছবি দেখেন। কেউই এর ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি।

বিমাতার কাছে খ বাবু খুব আদরে যত্নে বড় হল। প্রতি বছরেই ছবি তোলা হয়েছে তারপর। কিন্তু সে ছবিতে মৃতাদের দেখা যায় নি।

আমি বললাম, 'এখন ছবি নিয়ে উনি কোথায় যাচ্ছেন?' শুনলাম, ওঁর সেই বিমাতাও মারা গেছেন। উনি যাচ্ছেন ঢাকা থেকে কলকাতা, তারপর যাবেন গয়া। গয়াতে গিয়ে চার মায়ের পিণ্ড দেবেন আর কাশী গিয়ে ছবিটি গঙ্গায় দেবেন।

সত্যি জানি না, মিথ্যে জানি না, তবে ওই দেখেছিলাম ভূতুড়ে ছবি। মৃতাদের চেহারা এখনো মনে আছে।

বছর দশেকের ছেলেটা, মাথায় রুক্ষ, লালচে চুল। কোমরে থাকে একটা হাফপ্যান্ট আর মাথাটি ঝেঁকে ঝেঁকে ও যখন চলে তখন চারদিকে চেয়ে চেয়ে যায়।

শুকনো কাঠকুটো দেখলেই কুড়িয়ে নেয় খপ করে। অনেকদিন ঘোরাঘুরি করে ও রোহিনী বাজারের দোকানীদের কাছ থেকে একটা নুনের বস্তা পেয়েছে।

বস্তাটা ওর সঙ্গের সাথী। এখন ও কাঠকুটো যা পাবে তাই ওতে ভরবে। বাবুদের বাগানও। গাই বাগালি করতে গিয়ে ওর গরু খোঁজে ঘাস, আর ও খোঁজে ঝোড়ো হাওয়ার পোড়ো আম, শুশনি কলমি শাক, মেটে আলু। সব ও তুলে তুলে বস্তাটায় ফেলে। বাজপাখির মত ধারালো চোখ ওর।

বাবুদের গরু নিয়ে ও ডুলং-এর একটুখানি জল পেরিয়ে চরে ওঠে। চরের ঘাসে গরু চরে আর খায়। ও এই চর পেরিয়ে দৌড়ে যায় সুবর্ণরেখার জঙ্গলে। এখানে ডুলং নদীর এক ধারা। সুবর্ণরেখার দুই ধারা। তিনটি স্রোত, দুটি চর। আরো উজিয়ে গেলে সুবর্ণরেখা আর ডুলং হাত ধরাধরি করে নেচে চলেছে।

ছেলেটা সুবর্ণরেখার জলে ঘোচনা পেতে রেখে যায়। ঘোচনা হল বাঁশের বোনা খাঁচা জাল। ঘোচনার ফাঁদে মাছ পড়ে ফাঁদে। ছেলেটা যদি মাছ পায় গুঁড়ো কুচো তাহলে মহা নিশ্চিন্ত।

তখন ও মাথা ঝেঁকে ঝেঁকে আঙুলে গোনে,—শাক তুলেছি, শাক খাব। কুচো মাছের টক খাব। মেটে আলুটা দোকানে দেব, নুন নেব, তেল নেব।

তারপর, একা একা তিনটে নদী দুটো চর, গাইগরু আর ঘাস

কাশকে শুনিয়ে ও গল্প বলে মাথা নাচিয়ে নাচিয়ে,—তারপরে না, যুদ্ধ হল! সে কি ভীষণ যুদ্ধ, কি যুদ্ধ! তীর চলেছে শন্ শন্। কামান হাঁকছে দমদম। ঘোড়া ছুটছে খট খট সে কি যুদ্ধ!

যুদ্ধ আর যুদ্ধ। কিসের যুদ্ধ, কেন যুদ্ধ কিছু জানে না ছেলেটা। শুধু জানে যে ভীষণ যুদ্ধ হল।

কেন যে ছেলেটা শুধু যুদ্ধেরই গল্প বলে, আকাশ-বাতাস কাশ তিনটে-গাইবাছুর আর কালো-সবুজে জেব্রা ফড়িংদের, তা কেউ জানে না, কেননা কেউ গরু-বাগাল ছোট ছেলেদের কথা ভাবতে সময় পায় না।

ছেলেটা কেন যুদ্ধের কথা বলে তা জানতে হলে ছেলেটার সকাল থেকে কিছুক্ষণের রুটিনটা জানতে হবে।

কাক ভোরে ও ওঠে আর ওদের অসম্ভব নীচু ঘরটা থেকে বেরিয়ে আসে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে। খুব অধৈর্য হয়ে পুব আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। সূর্যকে যেন ও বলতে চায়, উঠে পড়ো বন্ধু, তুমি আর আমি, আমাদের তো ছুটিছাটা নেই। দেরি করছ কেন?

এই সময়ে ও ছুটে যায় ডুলং নদীর ধারে। সেখানে যায় কেন বল তো? নদীর জল আর নদীর পাড় ওর বাথরুম। ওর মত অনেক মানুষের।

ঘুম চোখ ধুয়ে একছুটে ফিরে এসে ও ঘর থেকে ছাগল দুটোকে বের করে উঠোনে কাঁঠালগাছের সঙ্গে বেঁধে দেয়। অনেক কাঁঠালপাতা আর জল রাখে। বেলা হলে ওর বন্ধু যখন ছাগল চরাতে যাবে, এ দুটোকে নিয়ে যাবে।

তারপর ওর মস্ত ঘরে আবার ঢোকে। খুব বড় ঘর। কেন না দু দিকে দেয়াল ভেঙে আকাশ ও মাঠ দেখা যাচ্ছে। তাতেই ছোট ঘরটা খু—ব বড় হয়ে গেছে। ওর ঘরে রাতে চাঁদ আর দিনে সূর্য বাঁধা আছে। কেন না ঘরের চাল ভাঙা। সে ফোকর দিয়ে জ্যোৎস্না আর রোদ যে যার সময়ে খেলা করে ডিউটি দিয়ে চলে যায়। এই

ঘরে ওর রাজপালঙ্ক হল এক বাঁশের মাচা। সে মাচাতে চাটাইয়ের ওপর কাঁথার ডানলিপিলো। মাচার নীচে ঢুকে ও এক খোরা পান্তা ভাত বের করে। খানিক ঢেলে নিয়ে হুশহাশ করে খেয়ে চলে যায় কাজে।

কত যে কাজ ওর থাকে। বাবুদের বাড়ি কত বড়। পাথরে বাঁধানো মস্ত উঠোন। বাবুদের পূর্বপুরুষ তৈরী করেছিল বাড়ি। বড় বড় চৌকো পাথর কোথা থেকে করা এনেছিল? বাবুদের হাতি রাখার জন্যে পাথরের এক খুব উঁচু থাম দেয়া ঘর ছিল। বর্ষায় বা শীতে হাতি থাকবে কোথায়?

সে-ই হাতিঘরের চারিদিকে দেয়াল গেঁথে তুলে বাবু ধান রাখে। পূর্বপুরুষের তৈরী পাথরের একতলা বাড়ির ঘরে ঘরে ধান-কলাই। বাবু নতুন বাড়ি তুলে নিয়েছে।

এই মস্ত উঠানটা ঝাঁট দেয় ছেলেটা ছুটে ছুটে। দেউড়ি ঝাঁট দেয়। টিউবয়েলের জল নিয়ে দেউড়ি ফটকের সামনে ছিটোয়। বাগানে জল দেয়।

এত কাজ সারা হলে তারপর ও গরুবাছুর নিয়ে বেরায়। গরু-বাছুর নিয়ে যাবার পথ ওর গ্রামের বেসিক প্রাইমারি স্কুলের পাশ দিয়ে। স্কুলের নতুন মাস্টার ছেলেদের রোজ গল্প বলে। গল্প বলে খানিকক্ষণ, তারপর পড়াতে থাকে।

গল্পটা যে মহাভারত, তা ছেলেটা জানে না। ও শুধু একটু শোনে তখন ভীষণ যুদ্ধ হল। খুব তীর চলল, খুব যুদ্ধ।

একদিন মাস্টার বলল, সিপাহী যুদ্ধের কথা। কি বলছে তা তো ছেলেটা জানে না। ও শুধু শুনল, তখন ভীষণ যুদ্ধ হল। খুব কামান ছোঁড়া হল।

মাস্টার ওর ঝকঝকে চোখ আর জিজ্ঞাসা ভরা চোখ পড়তেই ও মাথা ঝেঁকে ঝেঁকে চলে যায়। কাঁধে বস্তাটাই থাকে।

বস্তাটা নিয়ে ও ভীষণ যুদ্ধই করে। রোজ শাকটা, মাছটা

কাঠকুটোটা নিয়ে ও বস্তায় ভরে, গরুর পিঠে চাপায় আর ঘরে নিয়ে আসে।

কি যত্ন যে করে বস্তাটাকে, তা যদি দেখতে। ডুলংয়ের জলে বস্তা কাচে আর গাছের ডালে ডালে শুকোয়। বর্ষার জলে বস্তাটা ওর জল আটকাবার বর্ষাতি। শীতকালে বস্তাটা ওর লেপ।

বিকেল হলে ও বাবুর বাড়িতে বসে চারটি মুড়ি খায়। তারপর গরুবাছুরকে খেতে দিয়ে গোয়ালে তুলে দিয়ে, গোয়ালে সাঁজাল দিয়ে তবে ওর ছুটি।

তখন ও বস্তাটা নিয়ে ঘরের দিকে ছোটে। বাপ রে বাপ এখনি তো ওর আসল কাজ। ঘরে বসে থাকে ওর দাদু।

দেখ কি কাণ্ড। না বলেছি ছেলেটার নাম, না বলেছি ওর দাদুর নাম।

ওর দাদুর নাম মতিরাম। ওর নাম পতিত। ওরা জাতে মুণ্ডা। মুণ্ডা মানে আদিবাসী। তবে পতিত নিজের ভাষা, যার নাম মুণ্ডারী ভাষা, তা জানে না।

মতিরাম বসে থাকার মানুষ নয়। আদিবাসীরা যত বুড়ো হোক, বসে থাকে না। মতিরাম বসে থাকার মানুষ নয়। কিন্তু পতিত যখন এতটুকু ছেলে, কলেরায় ওর বাবা আর মা মরে গেল। সে ভারি এক অবাক কাণ্ড।

ওরা ছত্রিশজন লোক জেলে গিয়েছিল। বছরের পর বছর যে বাবুর জমিতে বর্গা করে, সেই বাবুর জমির ধান লাগাতে গিয়েছিল। বাবু যে ওদের কিছু জানায় নি। আর শহরে বসে আরেক বাবুকে জমিজমা বেচে দিয়েছে, তা তো কেউ জানে না।

নতুনবাবু বলল, আরে! এরা কে এসে আমার ক্ষেতে ধান চারা রুইতে লেগেছে বাবু? আমি তো জানি না।

এ হল গে, আট নয় বছর আগেকার কথা। নতুন বাবুর কথায় পুলিশ সকলকে জেলে নিয়ে গেল। ঘরে ফেরার সময় কোন মেলায় পচা খাবার খেয়ে কলেরা হয়ে পতিতের বাপ মা মরে গেল।

মতিরাম বলল, ঠিক আছে। আমি কাজ করে নাতিকে মানুষ করব।

মতিরামই এখানে চলে আসে আর বাবুদের বাড়ী কাজ নেয়। বাবু অবশ্য বলত,—মতিরাম! তোর নাতিটাকে দে। বাগানের কাজ করবে।

না বাবু। তা হবে না।

কেন রে?

আমার জনম গেল বাগালি কাজ করে আর পরের জমিতে খেটে। ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখাবার বড় ইচ্ছে ছিল। তা ছেলের মা মরে গেল। বাবু তো একা আমাকে খেতে দিত। বাড়িতে ভাতটা আনতে দিত না। ছেলেটা কি খায়? সে লাগল বাগালি কাজে। তাতেই তার লেখা-পড়া শেখা হল না।

সে তো ভালই করেছিলি।

কি ভাল করলাম বাবু?

ছেলেকে যে বাগালি কাজে দিলি!

কেন? খেতে পায়নি, তাতেই তো সে গিয়ে বাগাল হল, না কি বল্?

খেতে তো পেত! মুড়ি পান্তা…

নাতিটাকে দে।

না বাবু। নাতিকে আমি লেখাপড়া শেখাব। আমি জানতাম না লেখাপড়া, তাতেই না জমি চলে গেল। কতকষ্ট করলাম সারা জীবন।

লেখাপড়া শিখাবি? তোদের ছেলেরা লেখাপড়া শিখলে আমাদের কাজগুলো কে করবে?

না বাবু, ওকে কাজে দেব না।

খুব জেদ ছিল মতিরামের। ওর যখন ভারি অসুখ হল, হাসপাতাল যেতে হল। যে সময়েই পতিত হল বাবুর বাগাল।

ফিরে এসে মতিরাম পতিতকে খুব মেরেছিল। বলেছিল তোর বাবা যখন তোর মত ছোটো, তখন এত ইস্কুল ছিল না? এখন গ্রামে গ্রামে ইস্কুল হয়েছে, তুই পড়বি না?

সুবল সিং, এক বুড়ো মুণ্ডা, সে মতিরামকে খুব বকেছিল বলেছিল,—মতিরাম! এখন তোর শরীর খারাপ। পরিশ্রমের কা তুই পারবি না। ছেলেটা পড়বে যে, খাবে কি?

এ সব কথার কি জবাব হয়? মতিরাম আর কিছু বলে নি রাগের চোটে ওর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল। ও বলল,—বেশ বাবু যা বলেছিল তাই হল তো? আমাদের ছেলেরা লেখাপড় শিখলে বাবুদের কাজ চলে না। তাই হোক, তাই হোক।

যেন কেমন হয়ে গেল মতিরাম। এখন কাজের মধ্যে ঘরে বসে খেজুর পাতার চাটাই বোনে আর হাটে বেচে। ও কেনে চাল পতিত আনে তেল নুন।

আজ, পতিত ঘরে ফিরতে মতিরাম বলল,—মাস্টারটা এসেছিল তোকে ইস্কুলে পাঠাতে বলে।

তুই কি বললি?

আমি বললাম, ইস্কুলে যাবে তো খাবে কি? বাতাস খেয়ে থাকবে?

কি বলল?

আর কি বলবে?

আমি তো পড়তে চাই।

আর কথা বলল না পতিত। কাজ তো ফুরায় না ওর। এখন টিউবয়েল থেকে জল আনবে, রান্না করবে। রান্না তো হয় রাতে সকালে পান্তা খাও, সারাদিন চুপ করে থাকো।

রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল, ভীষণ একটা যুদ্ধ হচ্ছে আর পতিত নিজেও খুব লড়ছে।

পরদিন মাস্টার ওকে ধরে ফেলল।

এই, শোনো, শোনো।

কি বাবু?

তুমি ইস্কুলে আসনা কেন?

কেমন করে আসব।

তুমি আস না, তোমার মত আরো কয়েকটা ছেলে আসে না।

আমরা যে বাগাল গা।

পড়লে পরে টাকা পাবে, মাইনে লাগবে না।

পতিত এ কথার জবাবে পায়ের বুড়া অঙ্গুল দিয়ে মাটি খুঁড়ল খানিকটা। তারপর বলল,—যুদ্ধ যুদ্ধ বল তুমি. যুদ্ধটা কোথায় হয়. না কি হয়ে গেছে?

মাস্টার ওর চোখের দিকে চেয়ে দেখে। চোখ যেন তো হীরের ছুরি।

যুদ্ধ তো অনেকই হয়েছে রে।

এখন আর হয় না?

হলে কি করবি?

পতিত হাসল। তারপর বলল,—তুমি তো বেঁধে খাও। মেটে আলু খাবে? বেশ খেতে।

তুই স্কুলে আয়, তখন নব। ছাত্র দিলে নিতে পারি নইলে নব কেন?

পতিতের চোখ দিয়ে মেঘ ভেসে চলে যায়। সে বলে,—দাদু তো পড়তে বলত।

তাহলে?

আমি গিয়ে বাগাল হলাম।

কেন?

দাদুর অসুখ হইছিল। খুব অসুখ।

এতেই ওর সব কথা বলা হয়ে যায় যেন। মাথা ঝেঁকে ঝেঁকে চলে যায় ও। ওর দিকে চেয়ে খুব কমবয়েসী মাস্টারটি বোঝে যে পতিতও মস্ত একটা যুদ্ধ করছে, শুধু ও তা জানে না।

মুণ্ডাপাড়ায় প্রৌঢ়া আলোমণি সারাদিন অন্যের ক্ষেতে খাটে। বিকেলে ও মাস্টারকে খাওয়ার জল এনে দেয়। স্কুলের আঙিনায় মাস্টারের একখানা ছোট ঘর। মাস্টার তাকে 'মাসি' বলে। আলোমণি খুব শক্তপোক্ত মানুষ।

মাসি, পতিত পড়ে না কেন ?

পড়লে তাকে কে খাওয়াবে ?

তোদের ছেলেমেয়েরা পড়বে না, সরকারের ব্যবস্থা যে বিফলে যায়।

তুই কি বুঝবি ?

পড়লে পরে ভালো হত।

সে তো জানি। আমাদের ছেলেগুলো আজ বাগাল, কাল ক্ষেতমজুর, বাস! জনম শেষ। পড়লে তো ভালো। কিন্তু খেতে দিব কি ? বাগালি করে, ছুটো ভাত মুড়ি পেল, মাসে পাঁচটা টাকা আনল। তাতে সংসার বাঁচে। আমরা সংসার বাঁচাই আর ছেলেদের চোখ বইতে কানা করে রাখি, এ কি সাধ করে করি ?

পরদিন পতিতকে ডেকে মাস্টার বলে,—দেখ্, যুদ্ধের কথা ভালবাসিস, এই ছবিটা দেখ্।

কার ছবি ?

বীরসা ভগবানের। নাম জানিস ?

না তো।

তোর জাতের লোক। মুণ্ডা। খুব যুদ্ধ জানত আর যুদ্ধ করেই মরে যায়। পড়তে এলে পতিত সব জানতে পারতিস। নিজেই পড়তিস।

আজ আর পতিত নদীর চরে গিয়ে অন্য কথা বলে না। দুই হাত ছড়িয়ে চরের ওপর দিয়ে দৌড়ে চলে যায়। রিনরিনে গলায় আকাশ—নদী—ঘাস কাশকে বলে যায়। জাতের লোক বীরসা ভগবান। ভীষণ যুদ্ধ করেছিল, ভীষণ যুদ্ধ।

পতিতের আনন্দ দেখে ডুলংয়ের ঘোলা জল সুবর্ণরেখাকে বলতে চায় গল্পটা। ছুটে চলে যায় কলকল শব্দে। নদীর ওপার থেকে রামেশ্বরের মন্দিরটা ঝুঁকে পড়ে সে কথা শুনে। ডোরা কাটা ফড়িংরা পাখনা কাঁপিয়ে উড়ে যায়।

সন্ধ্যাবেলা পতিত মতিরামকে বলে,—দাদু! বীরসা ভগবানের নাম জান ?

সকল মুণ্ডা জানে।

কি করেছিল সে?

তা তো জানি না। নামটা জানি।

পতিত ভাত নিয়ে নাড়েচাড়ে। তারপর বলে,—আমি পড়তে যাব।

কেন?

এখন তোমার অসুখ নেই। ইস্কুল হয়ে গেলে উঠানে লঙ্কার গাছ করব। রোহিনীর হাট কত বা দূরে বেচে আসব তরকারি। পড়ব আমি।

মতিরাম ওর দিকে চেয়ে থাকে। তারপর শুকনো গলায় বলে—দেখব।

বল, পড়তে দিবে।

পতিত। তুই জানিস না, দেখিস নাই কখনো। আমাদের সমাজের সভা হবে। সেথা কথাটা উঠাই। পাঁচবলা কি বলে তা দেখি।

সভা হবে। আমি দেখব।

যাবি? নিয়ে যাব।

পতিত সমাজের সভায় যাবে সেদিন বাগালি কাজ করবে না শুনে বাবু বেজায় রেগে যায়। রাগটি সে মনের মধ্যে চেপে রাখে। বলে,—এ আবার কি কথা রে তোদের? শুনে যে হেসে বাঁচি না। জংলী ভূত তোরা, তোদের আবার সমাজ। তাদের আবার সভা।

পতিত বাবুকে কিছু বলতে পারে না। কোনোদিন বলে নি। চট করে বলতে পারে না। কিন্তু বাড়ি এসে গোঁজ হয়ে থাকে। সবসময়ে সে পতিত বড়দের মত কাজকর্ম করে, সে হঠাৎ ছোট ছেলে হয়ে যায়। দাদুকে বলে,—আমরা জংলী ভূত?

কে বলেছে?

বাবু।

না পতিত। আমরা কেন জংলী ভূত হব?

লেখাপড়া শিখি না, ভাঙা ঘরে থাকি, তাতে বলল? রং কালো তাতে বলল?

ভূত হলে ভূত আছি। ভূত ছাড়া তো তাদের গরু চরানো, মাঠে ধান চাষ, কোনো কাজ হয় না।

আমি যাব না বাবুর বাড়ি আর।

বুঝেছি। চল্, গিয়ে সাবান কিনি, সোডা আনি। কাপড়টা তো কাচতে হবে। সমাজে যাব বলে কথা।

সবাই ওরা সমাজের সভায় চলে। যে যা খাবে মুড়ি ছাতু ভাত, বেঁধে নিয়ে এলো। গরিবের সমাজসভা। যে যার খাবার খাবে। আলোমণিরাও এসে পড়ে।

কত বড় সভা, কত লোক। পতিত অবাক হয়ে দেখে। তার দাদু গরিব বলে কেউ হেলা করছে না। কতজন কথা বলছে। কেউ বলল,—নাতি বুঝি? মুখ দেখল বলে দিতে হয় না যে কার ছেলে। এ যেন মানিকচাঁদকেই দেখছি।

তারপর পতিতের অবাক চোখের সামনে একটা মস্ত ছবি তুলে ধরা হয়। বাঁশের চাটাইয়ের ওপর কাগজ এঁটে তাতে মোটা তুলিতে আঁকা। কি সুন্দর চেহারা, কি রকম পাগড়ি বাঁধা মাথায়, চোখ যেন জ্বলছে আলোর মত।

বীরসা ভগবান! বীরসা ভগবান! ভীষণ যুদ্ধ করেছিল!!—পতিত চেঁচিয়ে ওঠে। তার গলা ছাপিয়ে কয়েক হাজার গলা বলে ওঠে,—জয়ার বীরসা ভগবান!

পতিতের বুক ভরে ভরে ওঠে! জংলী ভূত! জংলী! জংলী ভূতদের এমন বীরসা ভগবান থাকে না কি? দাদুর হাত ধরে ও দেখতে থাকে আর মাথাটা ওর খুব উঁচু হয়ে যায়। কক্ষনো ওরা জংলী নয়, আর বাগাল হয়ে থাকাই ওদের কাজ নয়। কেন ওরা ভাঙা ঘরে থাকে, কেন দাদুর ধুতিটা এমন ফুটিফাটা, সব পতিত একদিন জেনে ফেলবে। সব জেনে ফেলবে ও। বুকের মধ্যে কি যেন তোলপাড় করে। যেন ডুলং আর সুবর্ণরেখা এ-ওর বুকে ঝাঁপাচ্ছে। গেরুয়া জলে বান ডেকেছে।

সেই যে সমাজ—সভায় যায় পতিত, আর সে বাবুর বাড়ি যায় না। বাবু তো বেজায় লাফঝাঁপ জুড়ল। বেটা বাগাল এমন কামাই করছে? দেখাব মজা।

কাকে মজা দেখাবে কে দেখাবে? গণ্ডগ্রাম, গণ্ডগ্রাম! খড়্গপুর থেকে গুপ্তমণি বাসে এসো। আবার বাসে চড়ো। নামো শিমড়াতলা। তারপর পায়ে হাঁটো ধানক্ষেতের আল ধরে চার মাইল। তবে পৌঁছবে গ্রামে।

বাবুরা ছয় ঘর। বাকি সব তো ওরাই। ঘরে ঘরে বাগাল ছেলেগুলো গরহাজির। পতিতের বাবু শেষে মতিরামের কাছে গেল।

ব্যাপার কি মতিরাম?

কিসের ব্যাপার?

পতিত যে গেল না?

পতিত আর যাবে না। সে ইস্কুলে গেছে। ইস্কুলে গেলে টাকা পাবে, খেতে পাবে। বইখাতা পাবে। ও পড়বে।

বটে! বাবু রেগে উঠল, ইস্কুলে গেলে কি রাজা হবে?

তা কেন? মানুষ হবে।

এ তোদের ষড়যন্ত্র। ঠিক আছে। ক্ষেতখামারের কাজও তোদের দেব না আর।

মতিরাম হেসে বলল,- বাইরে থেকে লোক আনবে? স—ব আমাদের সমাজের লোক। কেউ কাজ করতে আসবে না। আমাদেরি নিতে হবে। জংলী ভূত তো আমরা। আমাদের মধ্যে মিলমিশ খুব বেশি।

বাবুর মুখ চুন হয়ে গেল।

আজ পতিতের আনা মেটে আলুটা মাস্টার নিল। নেবে না কেন বলো? পতিত তো ওর ছাত্র। ছাত্র কোনো জিনিস দিলে মাস্টার নেবে না?

ইস্কুল ছুটি হলে পতিত একাই ছুটে চলে গেল নদীর চরে। ঘোলা জলে চিত হয়ে ভসতে ভাসতে ও নীল আকাশকে হেঁকে বলল,— তারপরে না? ভীষণ যুদ্ধ হল। ডুলুং নদীর জল ঝুঁকে পড়া ঘাসবন সবাই যুদ্ধের কথা শুনতে শুনতে রোদ মেখে হেসে কুটিপাটি হল। পতিতটা কি বোকা, কি বোকা! ইস্কুলে গিয়েও যে নিজেই একটা ভীষণ যুদ্ধে জিতে গেছে তা ও নিজেই জানে না।

সনা

১৮৫৫-৫৬ সালে হয় সাঁওতালবিদ্রোহ। রাজমহল থেকে উত্তর পশ্চিমে সংগ্রামপুরে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। তাতে সাঁওতাল বিদ্রোহের সবচেয়ে নামকরা দুই নেতা সিদু আর কানহু দুজনেই বেজায় জখম হয়েছিলেন। সে সময়কার সব ইতিহাস তো লেখা হয়নি। তাই বীর সনা কিসকুর কথাও তোমরা জানতে পারনি।

সনা কিসকুর বাড়ি ছিল ছোট্ট মহুলা গ্রামে। গ্রামটি পাহাড়ের গায়ে। যাদব বা গোয়ালাদের গ্রাম। যাদবদের অনেক মোষ। সাঁওতাল ছেলে সনা কিসকু একজন গাইচরি।

এমন অনেক ছেলেই গাইচরি। তারা মোষ চরায়। যাদবরা ঘি আর দই বাঁকে বসিয়ে বেচতে যায় দূরে দূরে।

সাঁওতালী ভাষায় সাঁওতালবিদ্রোহের নাম হুল। তা সিদু কানহুর হুল যখন জমে উঠল, যাদব পুরুষরাও যোগ দিল সাঁওতালদের সঙ্গে। তারা গেল সনার মনিব বুড়ো পরতাপ যাদবের কাছে। পরতাপ একটা জ্ঞানীমানী লোক। ও ভাগলপুরে সাহেব দেখেছে। কহলগাঁওয়ে দেখে এসেছে এক ঠেঙো সাধু। রাজমহলে গিয়ে খাসা মতিচুর লাড্ডু খেয়েছে।

পরতাপ বলল, কি রে, সবাই এলি?

যাদবরা বলল, হুল্‌টা বেশ জমেছে।

তাতে কি?

আমরা কি বসে বসে দেখব?

এ একটা কথা বটে। ভেবে দেখি। —বলে চোখ বুজল পরতাপ। তারপর চোখ বুজেই বলল, হুল্। লড়াই। এখন, সড়কিগুলো আছে তোদের?

আছে।

অর্জুনের ঘোড়াটা?

আছে।

পরতাপ চোখ খুলে রেগে চেঁচিয়ে বলল, পঞ্চাশ জন যাদব আছিস পঞ্চাশটা সড়কি আছে। তবে গ্রামে বসে আছিস কেন? ফুরিয়ে যাবে না হুল? সনার সঙ্গে চলে যা এখনি।

সনার সঙ্গে?

পরতাপ যাদব নিজেই যাদব। আর তবুও সে বলল। এই জন্যে কথায় বলে যাদবদের বুদ্ধি নেই। সন তোদের ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে। হুল্ করতে হলে কোন সাঁওতাল নেতার কাছে তো যেতে হয়?

তাই হবে। কার কাছে যাব?

পরতাপ যাদব বড় বড় গোঁফে চাড়া দিয়ে বলল, সনা যার কাছে নিয়ে যাবে তার কাছে।

সনা তো ছোট ছেলে।

তা বললে তো হবে না। হুল্ শুরু করেছে যারা, তাদের কথা মেনেই চলতে হবে আমাদের। কামারবাগদী-ডোম সবাই নেমেছে আর সবাই সাঁওতাল নেতার কথা মেনে চলছে।

সনা বলল, আগে আমি খবর দিয়ে আসি। বলেই সনা বনের দিকে ছুট মারল। যাদবরা তো অবাক। মনে হচ্ছে হুল করনেবালা লোকদের সঙ্গে সনার যোগাযোগ ভালমতই আছে আর পরতাপ যাদব সবই জানে।

সনা ফিরল বিকেলে। বলল, আজ রাত পোহাবে, কাল কাকভোরে যেতে হবে। তোরা যে যার হাতিয়ার নিয়ে যাবি।

সনা "তুই" বলল বলে তোমরা অবাক হোয়ো না। "তুই" ওদের মুখে সবচেয়ে সহজে বেরোয়। "তুই" বললে অপমান, "তুমি" বললে আপনজন, "আপনি" বললে সম্মান, এ সব ঘোরপ্যাঁচ ওরা বোঝে না। এখন সবগুলোই বলে, তবে প্রাণের কথা "তুই"।

কাকভোরে যাদবদের নিয়ে সনা চলল। বনের মধ্যে পথ চোখে পড়ে না সহজে, সনা দেখে গাছের গায়ে তীরের ফলার চিহ্ন, কোথায় চারা গাছের মাথা ম্‌চড়ে ভাঙা, কোথায় পাথরের ওপর ছোট একটা গাছের ডাল পুব মুখো করে রাখা। নিশানা দেখে ও ছায়ার মতো নিঃসাড়ে হরিণের মত তীব্র বেগে নেচে নেচে চলে। বনের ঢালুতে পাথরের উঠান, বড় বড় ঝুঁকে পড়া পাথরের ফাঁকে গহ্বর। কোমরে কপ্‌নি, এক হাতে শাল গাছের ডাল, অন্য হাতে ধনুক, থুনথুনে বুড়ো ঠাকুরদা কিনুচাঁদ বসে আছে। খাম্বার মত।

কিনুচাঁদ বলে। এই পাথরের পিছনে গুহা। যে যার ঘর থেকে এখানে চাল ছাতু গুড় লবণ বয়ে এনে রেখে যা আগে। সাহেবরা যদি তাড়া করে, যুদ্ধ থেকে পালাতে হয়, এখানে আসবি। জখম হলে এখানে আসবি। এইসব কাজ সেরে চলে যা জঙ্গল ডাইনে রেখে পুব দিকে। মধু হেমব্রম ফৌজ নিয়ে বসে আছে, ডেকে নিবে। হাতে যেন শাল গাছের ডাল থাকে। হুল্‌-এর নিশানী। নিশানী না থাকলে ওরা চিনবে না। জমিদারের ফৌজ বলে মেরে দিবে।

যাদবের আসল সম্পত্তি মোষ। তারা বলল, মোষের কি হবে?

উঠে আয় উপরে, দেখ।

উপরে উঠে দেখা গেল, নিচু পাহাড় ঘেরা এতটুকু এক ঘাসে সবুজ জমি। গুহা থেকে ঝর ঝর করে নেমে যাচ্ছে, বয়ে যাচ্ছে ঝর্ণা।

কিসের বাথান গড়িস তোরা? আমাদের তিন দেবতা মঁড়েকো মারাংবুরু আর জাহের এরা কেমন বাথান গড়ে রেখেছে দেখ। সাহেব এলে তোদের আর আমাদের মেয়েরা, ছোটরা, মোষ ছাগল সব এখানে থাকবে। সনার সব জানে।

যাদবরা কিনুচাঁদের কথা মতো কাজ করতে ছুটল। আর কিনুচাঁদ মনের খুশিতে গান ধরল,

থাটি গেবোন হুল গেয়া হো
থাটি গেবোন হুল গেয়া হো

আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব

আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব—

যাদবরা যখন চাল-আটার বস্তা নিয়ে যাচ্ছে, তখন পরতাপ যাদবও চাল-আটার বস্তা নিয়ে রওয়া হল। যাদবরা তো বেজায় অবাক।

তুমিও চললে না কি?

বিন্নুচাঁদ যা বলে।

দূর থেকে বিন্নুচাঁদকে দেখে পরতাপ হাঁকল, হো! শুনতে পাচ্ছিস?

হো! পরতাপ যাদব হো! শুনতে পাচ্ছি।

কথা ছিল।

উঠে আয়।

হাঁপাতে হাঁপাতে উঠল পরতাপ। বলল, আমার কি কাজ? ওরা তো চলল।

আমি বলে, তুই গ্রামে। তোর এই কাজ। যদি হুল-এ জিতি তাহলে দুজনে আনন্দে নাচব। যদি এই হার জিত চলে, যদি হারি, তখন দুশমন ঢুকে যাবে গ্রামে। তুই গ্রামের মানুষদের প্রাণ বাঁচাতে বনে পাঠাবি আগে— তারপর চলে আসবি। এদের বাঁচানো আমাদের কাজ। জখম হবে যারা তাদের বাঁচানো আমাদের কাজ। হুকুম মতো কাজ করতে হবে তো?

বেশ।

আজ তিন চার জনের খাবার পাঠাস। খবর পেলাম, জখম হয়েছে তারা, এসে যাবে।

পাঠাব। না, সঙ্গে করে সনাকে পাঠাব না, আমিই আসব। এখন চলি।

পরতাপের কাণ্ড দেখে অন্য যাদবরা মাথা নেড়ে হুল্-এ যোগ দিতে চলে গেল। কি চালাক আর চাপা ওই পরতাপ যাদব। নিজে

দিব্যি হুল্-এর কাজ করছে, কিচ্ছু বলেনি ওদের। পরতাপ আর সনা ফিরে এল।

হুল্ এর খবর চলে শাল পাতার নিশানায়, পাথরের উপর রাখা ডালপালার চিহ্নে।

যাদবরা যাবার চারদিন বাদেই সংগ্রামপুরে হল সেই ভীষণ যুদ্ধ। সে যুদ্ধের কথা আমি আর কি বলব, সাঁওতাল সমাজ গানে গানে যে কথা ধরে রেখেছেন।

পিয়ালাপুরে ইংরেজ হেরে গিয়েছিল। সংগ্রামপুরে ইংরেজ এল কামান-বন্দুক-গোলাবারুদ নিয়ে। সাঁওতালরা পাহাড়ে ইংরেজরা নিচে। তীর ধনুক টাঙি নিয়ে তিনশো সাঁওতাল, সঙ্গে যত যাদব কামার-কুমোর, নেতা তাদের সিহু-কানহুর ছোট ভাই চাঁদরাই। হুল! হুল্! বলে চাঁদরাই সৈন্য নিয়ে নামছেন। কৌশলী ইংরেজ প্রথমে ছুঁড়ছে ফাঁকা বন্দুক। চাঁদরাই সাঁওতাল, ছলনা জানেন না। তিনি বলছেন, ওরা পারবে না, ওদের গুলি নেই।

তারপর গুলি আর গোলা ঝাঁকে ঝাঁকে। চাঁদরাই পড়ে গেছেন। হাজার হাজার সাঁওতাল নিয়ে নাগারা ধামসা বাজিয়ে নামছেন সিহু কান্হু ঝাঁকে ঝাঁকে তীর, ঝাঁকে ঝাঁকে গোলাগুলি জখম সিহু, জখম কান্হু। সংগ্রামপুরের মাটি রক্তে লাল।

কবেকার, কবেকার সে কথা? এখন সে কথা শুধু গান।

> সিহু, তুমি কেন রক্তে মাখামাখি?
> কান্হু, তুমি কেন বলছ হুল্! হুল্?
> আমাদের ভাইদের জন্যে রক্তে স্নান করেছি আজ
> বেনিয়া চোরের দল
> আমাদের জমিজমা কেড়ে নিয়েছে বলে॥

কোথায় সিহু, কান্হু কোথায়? তাদের ধরলে পরে বখশিস্! কিন্তু তাদের খোঁজ মিলল না।

যাদবরা যারা বেঁচেছিল, সাঁওতালরা, সিছু-কান্‌ছুকে আর যত জনকে পারে বয়ে এনেছিল মহুলা জঙ্গলের গুহায়।

পরতাপ বাদব যাদবপাড়া, সাঁওতালপাড়ার সকলকে নিয়ে চলে গিয়েছিল জঙ্গলের আরো ভেতরে। গুহাতে আছেন সিছু-কান্‌ছু। আছে জখম হয়েছে যারা। যদি ছোট ছেলে কাঁদে তবে তো গুহাতে হাজির হবে ইংরেজ। তাই গুহায় রাখা চলবে না গ্রামের লোকদের।

জঙ্গলের ভেতরে, অনেক ভেতরে চলল পরতাপ যাদব। যাবার আগে ফিস ফিস করে সিছু কান্‌ছুকে বলে গেল। কোনো চিন্তা নেই। তোরা ভালো হয়ে উঠলে স ব ঠিক হয়ে যাবে।

কার্ত্তিক মাস। গাছের পাতায় টুপ টুপ হিম ঝরে। পরতাপ গ্রামের লোকদের ভরসা দিয়ে নিয়ে চলল।

সনা আর অন্য গাইচারদের ওপর পড়ল মস্ত ভার। মোষগুলিকে তাড়িয়ে জঙ্গলে নেওয়া মস্ত কাজ। সুবিধে হল, একেক ছেলে বিশ-তিরিশটা মোষ চরায়। মোষগুলি নিজের গাইচরিকে চেনে। মোষ বড় ভালো। বাঘ এলে তারা দল বেঁধে শিং বাগিয়ে তেড়ে যায় এমনও ঘটেছে।

গ্রামে আসার আগে সনা কিনুচাঁদকে জিগোস করল, ঠাকুরদাদা, ভুল্ আর হবে না?

কিনুচাঁদ আর জগন্নাথ মালবৈদ্য এখন শিকড় বাকড় বেটে জখম লোকদের চিকিৎসায় ব্যস্ত।

ওই গুহায় সিছু আর কান্‌ছু আছেন। একটি বার তাঁদের দেখার জন্যে প্রাণটা কেমন করে সনার। সোজা কথা! ছু জন লোকের নাম আজ সকলের মুখে মুখে আর সেই ছু জন ওই গুহার অন্ধকারে শুয়ে আছেন খড়ের বিছানায়। গুহার ভেতরে মানুষ আছে তা বোঝে সাধ্যি কার? একটু টুঁ শব্দ আসছে না।

সনার কথা শুনে কিনুচাঁদ বলল, পরে হবে, পরে। চলে যা তুই। সে সব কথা পরে হবে।

সনা বলল, ঠাকুরদাদা মড়েঁকোকে মানত করলে হয় না ? তুই যে বলিস ঠাকুর সব কথা শোনে।

পরে হবে সে কথা।

সনা মন খারাপ করে গ্রামে ফেরে। সিদু-কানহু কি ভালো হবে না ? চুলু কি আবার হবে না ? খুব মন খারাপ করে ও অন্য পাইচ'রদের বলে, তোরা চলে যা ভাই। মোষের পিঠে নিয়ে যা খড়, ঘর ঘর থেকে কাঁথা মাদুর, চাল ডাল। বয়ে নিয়ে দিস ভিতরে। কোথায় আছে পরতাপ যাদব আর গ্রামের মানুষ, তাদের দিস।

তুই কি করবি ?

যাব, পরে যাব।

সনা এখন পদমর্যাদায় ওদের নেতা বিশেষ। গাইচবিরা চলে যায়। সনা বলে, মোষগুলো তো ঢোকালি, তারপর দু পাঁচ জন পাহারা দিস সেখানে। বাকিরা থাকিস গাছের ডালে, মগডালে। পালা করে।

কেন ?

যদি গ্রামে সেপাই ঢোকে, যেমন করে হোক আমি নিশানা দেব।

তুই একা ?

যদি মারে তো একা মরলে ভাল। তা কি জন্যে বলি ? এখন লোক দরকার।

সবাই চলে গেল। হঠাৎ গ্রাম শুনশান্। ভূতে পাওয়া যেন। শরতে বন শিউলির গন্ধ। রাতে ফুট ফুটে জ্যোছ্না। দিনে আকাশ গাঢ় নীল, মেঘের চিহ্ন নেই। সব ঠিক ঠাক থাকলে কত ঢাক ঢোল বাজত, কত পুজো পরব হত ! কালীপুজোর দিন বাজি পোড়াত পরতাপ।

পরতাপের কথা মনে হতে সনার হাসি গেল। গত বছর ধরে মালাকরের কাছ থেকে মশলা এনে পরতাপ বাজি তৈরি করে, সনা সাহায্য করে।

ছেলেমানুষ, বেজায় ছেলে মানুষ পরতাপ যাদব। কালীপূজার পরের দিন যাদবদের "গাইখিলান" উৎসবে মোষগুলির শিঙে জড়িয়ে দেয় ফুলের মালা।

বাজি দেখতে সবাই। এবার আর সে সব হবে? সনা ভাবতে থাকল। ভাবতে ভাবতে ওর মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি গজাল। হাঁ, সেই ঠিক হবে। খড়ের মাচানের পিছনে। খড়ের উঁচু মাচান পরতাপের গোয়াল ঘরে। বাজির মালমশলা পরতাপের ঘরে।

তিন দিনের দিন বিকেলের সূর্যকে পশ্চিমে হেলিয়ে তবে বিশ বন্দুকবাজ সেপাই নিয়ে ছোকরা সাহেব হিউ ঢুকছিল গ্রামে।

যেই ঢোকা, অমনি খড়ের দড়িতে আগুন দিয়ে সনা দু হাত মাথার ওপর তুলে ওদের দিকে ছুটেছিল। এসো না সাহেব, এসো না, ওই বাড়িতে শত শত সাঁওতাল অপেক্ষা করছে। কি ভীষণ মূর্তি তাদের। গ্রাম ছেড়ে সবাই পালিয়েছে। আর এসো না।

সাঁওতাল? শত শত? কোথেকে এল?

কিছু জানি না সাহেব।

বলতে না বলতে হঠাৎ দুম দাম করে ভীষণ শব্দে কি ফেটেছিল, টলে উঠেছিল খড়ের মাচান, জ্বলে উঠেছিল দাউদাউ করে, ফটাস ফটাস ফাটছিল কাঁচা বাঁশের টুকরো। তার পাবে বাজির মশলা ঠাসা।

সান্থাল কামিং। বলে হিউ ঘোড়ার মুখ ঘোরায় আর সেপাইরা ঘোড়ার চেয়েও জোরে ছুটেছিল। তখন আগুন জ্বলছে।

ফটাস ফটাস বাঁশ ফাটছে। দাউ দাউ আগুন প্রথমে সন্ধ্যার লাল আকাশে, তারপর অন্ধকারে।

যার গোহাল আর ঘর পুড়ল সেই পরতাপই হেসেছিল সবচেয়ে বেশি। তারপর বলেছিল কবে ফিরব জানি না। ফিরব যখন তখন ঘরটা আর গোহালটা তোরা সবাই তুলে দিবি। বুঝেছিস?

কাঠ জ্বেলে পাথরের উনোনে রান্না চাপিয়েছিল মেয়েরা। সনাকে সবাই বলছিল, বাহাদুর বটে তুই।

সনা গিয়েছিল গুহাতে। গুহা ছেড়ে তখন চলে যাচ্ছে সবাই। দু জন মানুষকে সবাই নীরবে পথ ছেড়ে দিচ্ছিল।

সনা! —কানহু ডাকলেন।

সনা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। কানহু তার মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, কিনুচাঁদ! হুলটা তো চালাতেই হয়। কি বলিস সনা?

সনা মুখ তুলল। ও মা! কানহুর মুখে হাসি, হাসি সিদুর মুখে। চোখ বুজল ও। বিশ্বাস হয় না এত বড় সৌভাগ্য। আবার চোখ খুলল। কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। যেন কেউ ছিল না এখানে শুধু ছিল শাল বন আর শাল বন আর শাল বন।

সনা উঠে দাঁড়াল। কিনুচাঁদ বলল, একটা হরিণ দেখ সনা। শাল গাছের ছালে জড়িয়ে হরিণের মাংস ধিমা আঁচে পুড়ালে খেতে ভাল লাগবে খুব। অনেক দিন খাই না।

সনা ঘাড় হেলান, ধনুক নিল।

সমাপ্ত